ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৫ জানুয়ারি-মার্চ-২০০৬

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামী আইন ও বিচার

ISSN 1813 - 0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৫

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জানুয়ারি- মার্চ ২০০৬

যোগাযোগ : এস এম আবদুল্লাহ
সমন্বয়কারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা)
১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭২ ৮২৭২৭৬
E-mail : ilrclab@yahoo.com

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : তাসনিম কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ৩৫ টাকা US $ 3

Published by Advocate MUHAMMAD NAZRUL ISLAM General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 14, Pisciculture Bhaban (3rd Floor) Shymoli Bus Stand, Dhaka-1207,Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US $ 3

সূচিপত্র

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬
বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৫

সম্পাদকীয়

অসুস্থ সভ্যতা আমাদের মর্যাদাজনক জীবনের গ্যারান্টি নয়

সভ্যতার সহাবস্থান ছাড়া আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি সত্ত্বেও ব্যক্তি মানুষের জীবনে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইসলাম এটা প্রথম দিন থেকেই উপলব্ধি করেছিল বলেই আগমনের প্রথম দিন থেকেই তার বিরোধী সমস্ত ধর্ম চিন্তা ও মতবাদকে সে ছাড় দিয়ে এসেছে। কুরআনে বলা হয়েছে : 'তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং সৌজন্য সহকারে তাদের পরিহার করে চলো।' (মুযযাম্মিল : ১০) আল্লাহ বলেন, 'বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যা আরোপকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কাজটা আমার হাতে ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও।' (মুযযাম্মিল : ১১)

এ অবকাশ আল্লাহর জন্য, মুসলমানদের জন্য নয়। যতদিন ইসলাম টিকে থাকবে এবং মুসলমানরা যতদিন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন তাদের বিরোধী মতের আত্মপ্রকাশের সুযোগ তারা দিয়ে যাবে। চিন্তার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এভাবে ইসলাম প্রথম দিন থেকেই দিয়ে আসছে। ইসলাম দুনিয়ায় এসেছে মিথ্যাকে পরাজিত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। ইসলাম একমাত্র সত্য হওয়া সত্ত্বেও (ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম- ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত বিধান।) মক্কার প্রতিকূল এবং মদীনার অনুকূল পরিবেশে এবং পরবর্তী হাজার হাজার বছর ধরে যুক্তি তথ্যের ন্যায়ানুগ পদ্ধতি ছাড়া কখনো শক্তির ভাষায় ইসলাম কথা বলেনি। মুসলমানের ঈমানের মূল চেহারা হলো প্রথমে মনে স্বীকার করে নেয়া এবং তারপর মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে এই স্বীকৃতির প্রতিফলন ঘটানো। আর মানসিক স্বীকৃতির পেছনে শক্তি প্রয়োগের কোনো কারসাজি থাকতে পারে না। কাজেই বলপ্রয়োগে কাউকে যখন মুসলমান করা যায় না এবং তার মনোগজতে প্রভাব বিস্তার করতে হয় এবং তার মন জয় করতে হয় আর মন যখন ঈমানের স্বীকৃতি দেয় মুখে সেটা উচ্চারিত হয় এ অবস্থায় দ্বিতীয় ও বিরোধী পক্ষকে একশো ভাগ ছাড় দেয়াই স্বাভাবিক। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের প্রথম শত বর্ষের মধ্যেই ইসলামের নিখাদ সত্য সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বিরোধী পক্ষের চিন্তার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবখানেই পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকে।

বিরুদ্ধ পক্ষ প্রথম দিন থেকেই ইসলামকে সুনজরে দেখেনি। কিন্তু এর প্রতিবাদে ইসলাম ও মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো মারমুখী বা ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ নেয়নি। বিরুদ্ধ পক্ষ প্রথম দিন

থেকে ইসলামের কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টা এবং সর্বাত্মক নির্মূল প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু ইসলাম ক্ষমতা অর্জন করার পর কোনোদিন তাদের কণ্ঠরোধ করেনি। তাদের মতামত ও ধর্মের কথা প্রকাশ প্রচার ও প্রসারের পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। এভাবে বিরোধী মতকে ইসলাম দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেনি। বরং যুক্তি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তার মোকাবিলা করেছে। নিজের বক্তব্য রেখেছে এবং তাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়েছে। কখনো তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও সত্য বিকৃতি এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পথ অবলম্বন করেনি। মিথ্যাকে মিথ্যা জেনেও তার বিরুদ্ধে কথা বলার সময় তার মর্যাদাহানি এবং তার বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেনি।

কিন্তু এটা ইসলাম বিরোধী পক্ষের একক কৃতিত্ব, তারা রচনা করে 'রঙ্গীলা রসূল' মহানবীর স. কাল্পনিক ব্যঙ্গচিত্র। মহানবীর স. চরিত্রে মিথ্যা কালিমা লেপন করে তারা। এ প্লাটফর্ম তাদের একচেটিয়া দখলে। ইসলামকে হেয় করতে গিয়ে তারা ইসলামের নবীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়। যুক্তি তথ্য এবং দলীল প্রমাণের ভিত্তি এড়িয়ে তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। অথচ ইসলাম তাদের ব্যাপারে কেমন ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ বলেন, 'আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা উপাসনা-আরাধনা করে তাদের তোমরা গালি গালাজ করো না। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি গালাজ করবে।' (আল-আনআম : ১০৮) অর্থাৎ মুসলমানরা যদি ওদের অবতার-দেবতা নবী-রসূল মহাপুরুষদের চরিত্রে কলংক লেপন করে তাহলে ওরাও মুসলমানদের নবী-রসূলদের চরিত্রে কলংক লেপন করবে। তাই দেখা যায় ইতিহাসের কোনো পর্যায়ে মুসলমানরা এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমান বিরোধীরা তাদের উন্নত চরিত্রের প্রমাণ দিতে পারেনি। তারা বিনা উস্কানিতে বারবার শুধু মুসলমানদের নয়, বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হীনভাবে চিত্রিত করেছে। ডেনমার্কের জিল্যান্ড পোস্টেম পত্রিকায় গত বছর সেপ্টেম্বরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রকে বিকৃত ও হীনভাবে চিত্রিত করে যে ব্যঙ্গ কার্টুনগুলো ছাপানো হয়েছিল তারপর বিশ্বব্যাপী প্রবল প্রতিবাদের পরও পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের পত্রিকায় সেগুলোর পুনরমুদ্রণ ইউরোপের প্রাচীন জাহেলী বিকারগ্রস্ত মানসিকতারই প্রকাশ ঘটিয়েছে। তাদের সরকারগুলোও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাবার অথবা সমর্থন করার মাধ্যমে বিকৃত মানবিক রুচি ও বিকারগ্রস্ততার পরিচয় দিয়েছে।

আসলে বিষয়টি ইউরোপীয় সভ্যতার এক অসুস্থ চেহারা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। ইউরোপের এ অসুস্থতা সত্য ন্যায় ও ইসলামের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রকট। আধুনিক যুগের প্রারম্ভেই যে নবীর জন্ম, যে বিশ্বনবী আধুনিক যুগের সূচনা করেছেন, পরমত সহিষ্ণুতায় যাঁর তুলনা নেই, শান্তিময় সুশৃংখল সমাজ গঠনে যিনি আজো নজিরবিহীন, নারীদেরকে নির্যাতনের নিগড় থেকে বের করে যিনি উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, পরোপকার এমনকি চরম শত্রুর উপকার করা এবং তাকে সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যাঁর জীবনের মহান ব্রত তাঁকে অসুস্থ ইউরোপীয় মস্তিষ্ক চিত্রিত করেছে সন্ত্রাসী, নারী লোভী শয়তান রূপে (নাউজুবিল্লাহ)। তাঁর পাগড়িকে বানানো হয়েছে বোমার মত করে।

যে নবীর আগমন না হলে আধুনিক ইউরোপের জন্মই হতো না। যে নবীর অনুসারীরা মৃত গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করে। ব্যাপকভাবে তার চর্চা করে এবং তার মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের মিশেল ঘটিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবন আবিষ্কারের পথ প্রসারিত না করলে আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিই সম্ভব হতো না তাঁকে যারা শয়তান রূপে চিত্রিত করে তাদের বুদ্ধি ও সুস্থ মানসিক বৃত্তির দেউলিয়া হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বিক্ষুব্ধ তাদের এই দুরাচারিতায়। কিন্তু মুসলমানরা কি করতে পারে? মুসলমানরা কি অসহায়? মুসলমানদের ঈমান ও মুসলমানী অস্তিত্বের ওপর তারা চরম আঘাত হেনেছে। এ থেকে মুসলমানদের ও মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। তাদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হবার কারণে তারা আমাদের ওপর এ ধরনের আঘাত হানার সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষা আমরা তাদের কাছ থেকে লাভ করছি। অর্থনৈতিক লেনদেন ও অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের ওপর নির্ভর করছি। সভ্যতা ও আধুনিক জীবন ধারা তাদের কাছ থেকে ধার করে আনছি। মোটকথা আধুনিক জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে আমরা তাদের দ্বারস্থ হচ্ছি। আইন এখনো আমাদের দেশে তাদেরই চলছে। দেড় দুশো বছর আগে তাদের সুবিধার জন্য আমাদের আইন তারা বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের শাসন থেকে বেরিয়ে আসার অর্ধ শতাব্দীর পরও তাদের আইনের শাসনের জোয়াল আমাদের কাঁধে চাপিয়ে রেখেছি।

তবে তাদের এই চরম আঘাতের পর এখন সময় এসেছে আমাদের চেতনা ফিরে আসার। আমাদের স্বাধীন সত্তা এবং আমাদের জাতীয় মর্যাদা একমাত্র আমাদের ঈমানের সাথেই বজায় থাকতে পারে। আধুনিক শিক্ষানীতির সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের জাতীয় শিক্ষা নীতি গড়ে তোলা দরকার। আমাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক বিধি বিধান ও নিয়ম-কানুন আছে। হালাল-হারামের একটা কার্যকর ব্যবস্থা আছে। সমগ্র মুসলিম জনতা তা মেনে চলতে আগ্রহী। কারণ আমাদের জীবন ও ধর্মের সেটা একটা অপরিহার্য অংশ। তার ভিত্তিতে আধুনিক বিশ্বের সাথে সংশ্লিষ্টতা রেখে আমাদের নিজস্ব অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আর আইনের কথা। ইসলামী আইনের কথা শুনলেই অনেকে চমকে ওঠেন। মনে করেন হাজার বছরের পুরনো সেকেলে আইন। যুক্তি দেখে অবাক হওয়ার কিছুই নেই, বর্তমান বিশ্বে রোমান আইনের যে ডেভলপমেন্ট তা আসলে মুসলমানদের প্রথম সাত আটশো বছরের ফিকহের চর্বিতচর্বণই। এর ওপর বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট ও বিচার বিভাগ কিছু ঘসামাজা করেছে মাত্র, এর বেশি নয়। খোদ আমাদের দেশেও যে সমস্ত আইনের প্রচলন আছে সেগুলোও কিছুটা পরিবর্তন পরিবর্ধন করে ইসলামী আইনে পরিণত করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। তবে এজন্য আমাদের ঈমান ও স্বাধীন মনোবৃত্তিকে ঝালাই করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া আর কারোর পরাধীন হবো না এ মনোবৃত্তি জাগ্রত করতে হবে। আধুনিকতা ও সভ্যতা আমাদের কাছ থেকে অতি উচ্চ মূল্য আদায় করে নিচ্ছে। একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আধুনিক যুক্তি সিদ্ধ, শালীন ও সুসম জীবন ধারা গড়ে তুলেছিলেন। জীবনের সার্বিক সুযোগ সুবিধা লাভের ভিত্তি সেখানে গড়ে উঠেছিল। আজকে যে সুযোগ সুবিধাগুলো বেড়ে গেছে ইসলামী জীবন ধারার সাথে

তার গরমিলটা কোথায়? ফারাক কেবলমাত্র দৃষ্টিভঙ্গীর। আল্লাহর অনুগত জীবন এবং আল্লাহর বান্দার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা। অন্যের স্বার্থ হানি করে নিজের স্বার্থ লুটে নেয়া– এ দৃষ্টিভঙ্গী ইসলামের দৃষ্টিতে আধুনিক নয়। এটা অসভ্যতা এবং জাহেলীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী। আজকের ইউরোপ ও পাশ্চাত্য বিশ্ব যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে তার একটা বিরাট অংশ এই অসভ্যতা ও জাহেলীয়াতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। অন্যের ঈমানে আঘাত হেনে অসত্য কথা বলা এবং অসভ্য কাজ করাকে তারা নিজেদের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা বলে মনে করে। ছোট ছোট দেশ এবং দুর্বল জাতি ও জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, ফাঁদে ফেলে তাদের সম্পদ লুটে নেয়া এবং এভাবে নিজেদের আয়েশী জীবন যাপন করাকে তারা সভ্যতা নাম দিয়েছে। মানবতা বিরোধী স্বার্থলিপ্সু কিছু ব্যক্তি গোষ্ঠী ছাড়া সমগ্র বিশ্বমানবতা একে সভ্যতা বলে মেনে নিতে পারে না। কাজেই ইসলামী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী একটা যথার্থ আধুনিক জীবন ধারা গড়ে তুলতে পারে, যার মধ্যে পাশ্চাত্যের আধুনিক জীবনের যে কোনো মর্যাদাজনক কল্যাণকর সুন্দর শালীন বিষয়ের পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। এভাবে আমাদের নিজস্ব সমাজ, নিজস্ব জীবন ও নিজস্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার সময় এসে গেছে। প্রতিদিন পাশ্চাত্যের নিগ্রহ ও অশালীন আচরণের সঠিক জবাব হবে এ পথেই। পশ্চিমের নকল নবিশী ও পশ্চিমের দ্বারে ধর্ণা দেয়ার অবসান না ঘটালে বিশ্বে আমাদের মর্যাদাজনক জীবন সম্ভব নয়।

–আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬
বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৫, পৃষ্ঠা : ৯-১৮

ইসলামী শরীয়তের লক্ষ ও কল্যাণসমূহ

ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করে তাদের প্রতি করুণা করেছেন। তাদের একাকী ছেড়ে দেননি। বরং তাদের কাছে রসূল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোকে এনেছেন। তাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। এভাবে তাদের রক্ষা করেছেন সৎপথ থেকে বিচ্যুতি ও গোমরাহী থেকে।

এই রসূলগণ সবাই আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মাত্র দীন-জীবন বিধান এনেছেন। তাঁরা বিভিন্ন শরীয়ত এনেছেন। এর মূলনীতিগুলো অভিন্ন। বড় বড় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শরীয়ত প্রদান করা হয়েছে তাতে হত্যা, যিনা ও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করাকে বৈধতা প্রদান করা হয়নি।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বিধান দিয়েছেন। এই বিধান অনুযায়ী তারা জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং এমন আইন কানুন রচনা করবে যা তাদের জীবনকে সংবৃত্তি ও কল্যাণে ভরে দেবে।

বান্দাদের জন্য প্রদত্ত আল্লাহর এই শরীয়তগুলোর চূড়ান্ত লক্ষ একটিই এবং সেটি হচ্ছে ইহ ও পরকালে সাফল্য লাভ করা।

একথা নিসন্দেহে বলা যায়, সমস্ত আসমানী কিতাবের লক্ষ হচ্ছে মানুষকে সৎপথ দেখানো এবং অন্ধকার থেকে আলোকে বের করে আনা। এভাবেই সেখানে বিধান ও নিয়মকানুনের সমাবেশ করা হয়েছে। কুরআন করীমে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। রসূল প্রেরণ, কিতাব অবতীর্ণ, বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, 'সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে।'[১]

আল্লাহ আমাদের রসূল স. সম্পর্কে বলেন, 'আমি তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।'[২]

লেখক : ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম ছিলেন সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন বিভাগের চেয়ারম্যান। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থ 'আল মাকাসিদুল আম্মাতু লিশ্ শারীয়াতিল ইসলামীয়াহ' থেকে এ প্রবন্ধটি গৃহীত।

কিতাবসমূহ নাযিল সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বনি ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক।'[৩]

'তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইনজীল।'[৪]

বিশেষ করে কুরআনের মাধ্যমে মুসলমানদের কল্যাণ নির্ধারণ করে বলেছেন, 'এই কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পারো অন্ধকার থেকে আলোকে।'[৫]

তিনি বলেছেন, 'এই কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়াত দান করে এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।'[৬]

তিনি আরো বলেন, 'এটি সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটি পথনির্দেশ।'[৭]

এছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সংক্রান্ত ছোটখাটো অনেক বিষয়ের বিধানও সেখানে দেয়া হয়েছে। যেমন সালাত সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, 'অবশ্যই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।'[৮]

সওম সম্পর্কে বলেন, 'তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।'[৯]

যাকাত সম্পর্কে বলেন, 'তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করবে। এর সাহায্যে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।'[১০]

হজ্জের ব্যাপারে বলেন, 'আর মানুষের কাছে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সকল প্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে চড়ে, তারা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে।'[১১]

কিসাস সম্পর্কে বলেন, 'হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে, যাতে,' তোমরা সাবধান হতে পারো।'[১২]

মদ সম্পর্কে বলেন, 'মদ থেকে দূরে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[১৩]

পূর্বোক্ত আলোচনাগুলো থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের একাকী ছেড়ে দেননি। বরং তাদের মেহেরবানী করে সৃষ্টি করার পর তাদের কাছে রসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা সুসংবাদ এনেছেন এবং ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাতে রয়েছে সত্য, ন্যায়, ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের দিক নির্দেশনা। আর আছে মানুষের জীবনে এই কল্যাণ সাধনের জন্য ছোট-বড় সকল প্রকার বিধান। আল্লাহর সমস্ত বিধানই মানুষের কল্যাণার্থেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলেমগণের বক্তব্য এ বিধানের ক্ষেত্রে অভিন্ন। তবে তাদের ব্যাখ্যার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।[১৪] ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

লক্ষসমূহ

এ আলোচনাটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথমঃ লক্ষের আভিধানিক ও শরয়ী সংগা।

দ্বিতীয় : শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছা বিরোধী কাজ বাতিল হওয়া।

তৃতীয় : লক্ষসমূহের সাথে মুজতাহিদের পরিচয় থাকা জরুরী হওয়ার প্রমাণ।

লক্ষের আভিধানিক ও শরয়ী সংগা ঃ এখানে শরীয়ত প্রণেতার আইনগত উদ্দেশ্যসমূহের বিবরণ এবং আইনানুগ ইচ্ছার বিবৃতিসহ লক্ষের আভিধানিক সংগা বিবৃত হয়েছে।

লক্ষের আভিধানিক অর্থ ঃ প্রত্যেক সুউচ্চ ভিত্তিভূমি বা বালিয়াড়ির শীর্ষদেশ অথবা পর্বতের চূড়া। মূল 'হাদাফ' তথা টার্গেট শব্দটির বহুবচন আহদাফ যেমন গারায শব্দের বহুবচন আগরায।[১৫] শরীয়তের লক্ষ বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে, এমন সব উদ্দেশ্য যেগুলো বাস্তবায়নের জন্য আহকাম প্রবর্তন করা হয়েছে। শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে কল্যাণ সাধন। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে এগুলো বারবার ফিরে আসে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে কল্যাণ অর্জনে সে সফল হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না।[১৬]

উদ্দেশ্যগুলো প্রয়োজনপূর্ণকারী অথবা সৌন্দর্য বর্ধনকারী হতে পারে। তবে আলেমগণ উদ্দেশ্যসমূহকে পাঁচটি জিনিসের অন্তরভুক্ত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে : দীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ রক্ষা করা। কেউ কেউ মান-সম্মানের হেফাজত করাকেও এর অন্তরভুক্ত করেছেন। তবে প্রাণ ও বংশ রক্ষা মূলত মান-সম্মান ও মর্যাদা রক্ষারই নামান্তর। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। উপরোক্ত পাঁচটি জিনিসের একটিও যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে জীবন প্রণালী ব্যাহত হতে বাধ্য। সম্পদহারা হলে মানুষ বাঁচে না। বংশহারা হলে সে কিছুদিনের জন্য পৃথিবীতে টিকে থাকলেও পরবর্তী প্রজন্মের বিলুপ্তির সাথে সাথে তারও বিলুপ্তি ঘটে অথবা বংশ পরিচয়হীন হয়ে মানুষের মধ্যে হারিয়ে যায়। এভাবে প্রত্যেক বস্তুই নিজেকে মর্যাদাশালী করে। আর বুদ্ধি ত্রুটিপূর্ণ হলে সমস্ত পৃথিবীটাই বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। আসলে পৃথিবীটা একটা বোধজ্ঞানহীন পশু, কোনো চিন্তাশীল মানুষ নয়। বুদ্ধির আলোকে পৃথিবীকে আলোকিত করা যায়। জীবন সত্তায় যদি দেখা দেয় ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহলে জীবন প্রবাহ হবে বিফল এবং তা আর অব্যাহত থাকবে না। আর দীন ও জীবন বিধান যদি অপসৃত হয় তাহলে অজ্ঞতা ও মূর্খতা তাকে গ্রাস করবেই। ফলে মানুষ দুর্বিসহ জীবন যাপন করবে।[১৭]

এ কারণে আলেম ও বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত পাঁচটি জিনিসের হেফাজত করা ওয়াজিব করেছেন। মহান আল্লাহ এসব প্রয়োজনীয় জিনিসের হেফাজত ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আহকাম প্রবর্তন করেছেন। দ্বিতীয় এগুলো এমনভাবে রক্ষা করতে হবে যাতে একবার অস্তিত্ব লাভ করার পর আবার যেন বিলুপ্ত না হয়ে যায়। এসব জিনেসের সংরক্ষণ ওয়াজিব হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। একথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, আপন প্রাণ, বুদ্ধি ও ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা শরীয়তের উদ্দেশ্যের অন্তরগত। তাই হত্যা প্রতিরোধের জন্য কিসাস ওয়াজিব করা হয়েছে। মদ

হারাম করা হয়েছে। কারণ মদ পান করে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ফিতনা ও বিপর্যয় রোধের জন্য ব্যভিচার হারাম ও অন্যের অধিকার হরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনিভাবে চুরি ও ডাকাতির শাস্তি হিসাবে জেল ও জরিমানা ওয়াজিব করা হয়েছে।[১৮]

আলেমগণও বিষয়গুলোকে 'পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়' নামে অভিহিত করে এগুলোকে শরীয়তের মূলনীতিতে পরিণত করেছেন। এর সাধারণ লক্ষ হলো এগুলোর সংরক্ষণ করা। যেমন শাতবী বলেছেন, 'শরীয়তের যে সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ বিষয়গুলোর হেফাজত করতে হবে তা হচ্ছে পাঁচটি : দীন, প্রাণসত্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদ-সম্পত্তি।[১৯]

মক্কায় শরয়ী বিধান অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সীমাবদ্ধভাবে এসব প্রয়োজনীয় জিনিসের সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। কুরআন ও হাদীস যে মূল জিনিসের দিকে আহ্বান করে সেটি হচ্ছে দীন বা জীবনবিধান। মক্কায় এই দীন সম্পর্কেই প্রথম হুকুম নাযিল হয়। তবে প্রাণসত্তার সংরক্ষণের কথা কুরআনে এভাবে বিবৃত হয়েছে, 'যে প্রাণ হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না।'[২০]

'যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?'[২১]

আল্লাহ আরো বলেছেন, 'যা তোমাদের জন্য হারাম তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র।'[২২]

এ ধরনের আরো বিভিন্ন আয়াত এ প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে। এগুলো মক্কী আয়াত। এগুলো প্রাণ হত্যা হারাম ও পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। আর একান্ত প্রয়োজনের সময় ছাড়া মানুষ হারামকে প্রাধান্য দিতে পারে না।

আর বুদ্ধি সম্পর্কে বলতে গেলে এক কথায় বলা যায়, তাকে যে হরণ করে সে হচ্ছে মদ। মদ যদিও মদীনায় হারাম ঘোষিত হয় কিন্তু সীমাবদ্ধ ও নিষিদ্ধকরণের কাজ শুরু হয় মক্কায়। কেননা বুদ্ধির সংরক্ষণ মানেই হচ্ছে প্রকারান্তরে নিজের প্রাণসত্তার সংরক্ষণ। যেমন সমস্ত অংগ প্রত্যঙ্গ বললে চোখ, কান, নাক, এবং তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়া সবই বুঝায়। কাজেই বুদ্ধি শরীয়ত সম্মতভাবে প্রথমে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় মক্কায় সংরক্ষিত হয়, যদিও তা মুহূর্তকালের জন্য রহিত হয়।

বংশধারা সংরক্ষণ প্রসঙ্গে কুরআনের মক্কী আয়াতে ব্যভিচার হারাম হওয়া এবং স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের কাছে লজ্জাস্থানের হেফাজতের কথা বলা হয়েছে। জুলুম করা, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, অপব্যয় করা, মাত্রাতিরিক্ত খরচ করা, মাপে ও ওজনে কম দেয়া, জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা এবং এ জাতীয় বিভিন্ন কাজকে হারাম ঘোষণা করে ধন-সম্পদ সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য মান-ইজ্জতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলো কাউকে কষ্ট না দেয়ার আওতাভুক্ত। উল্লেখ্য, উপরোক্ত জিনিসগুলোর অস্তিত্ব থাকলেই তার হেফাজত করার প্রশ্ন ওঠে, অন্যথায় নয়। একথা শেষ চারটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে দীন হলো, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং শারীরিক

সহায়তায় এ বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার নাম। অন্তরে বিশ্বাসের অর্থ হলো, আল্লাহ, রসূল ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। মাদানী যুগে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনাও এর অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। তবে ঈমানের মূল বিষয় অবতীর্ণ হয় মক্কায়। আর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে ঈমানের তাগাদা পূর্ণ করাও এর একটি পর্যায়। এরপর বাড়তি বিষয়গুলো এর সম্পূরক। অর্থাৎ ইসলামের কার্যকর আরকান হচ্ছে চারটি।[২৩]

এ প্রেক্ষিতে মক্কী যুগে দুটি বিষয়ের সাক্ষ দিতে হয় : সালাত ও যাকাত। বস্তুত এভাবে আনুগত্যের অর্থ বুঝা যায়। রোযা ও হজ্বের কথা সম্পূরক হিসাবে মাদানী যুগে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য হজ্ব আদি পিতা ইবরাহীম আ.এর সূত্রে প্রথম পাওয়া আরবদের একটি পুরানো রেওয়াজ ছিল। ইসলামের আগমনে তার মধ্যকার বিপর্যস্ত বিষয়গুলো সংশোধিত হয় এবং সত্য ও সনাতনের দিকে সেগুলোকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। এমনিভাবে রোযাও জাহেলী যুগে আশুরার দিনে রাখা হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর নিজে এই রোযা রেখেছেন এবং রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পরে রমযানের রোযার নির্দেশ আসায় তা রহিত হয়ে যায়।[২৪]

এ থেকে আমরা জানতে পারলাম, শরীয়তের লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো, মানুষের কল্যাণ সাধন করা। যেমন মানুষের দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা হওয়া এবং সম্মানিত ও নন্দিত বান্দারূপে আল্লাহর কাছে স্বীকৃত হওয়া। এমনিভাবে যে মহাসংকটকালে প্রশান্ত আত্মা ছাড়া ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না, সেদিন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। কেননা মহান আল্লাহ ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং দুনিয়া আবাদ করার জন্য মানুষকে খলীফা করে পাঠিয়েছেন। যে আল্লাহর হেদায়াত অনুসরণ করবে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলবে তার দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনই এর চূড়ান্ত লক্ষ। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। নিসন্দেহে প্রত্যেকটি শরীয়ত মানুষের জন্যই প্রবর্তিত। শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে তার লক্ষস্থলে পৌছিয়ে দেয়া। অন্যথায় বিধান প্রবর্তন অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর বুদ্ধিমানদের অর্থহীন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াটা অচিন্তনীয় ব্যাপার। বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তির স্রষ্টার ব্যাপারে এ ধরনের কথা কল্পনা করাই অসম্ভব। সর্বশেষ শরীয়ত এবং সুদৃঢ় দুর্গরূপে গণ্য ইসলামী শরীয়ত কি তার লক্ষস্থলে পৌছুতে সক্ষম? নিম্নোক্ত আলোচনায় আমরা এর জবাব দেবার চেষ্টা করেছি :

শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যাবলী

সাধারণত আমরা জানি ইসলামী শরীয়ত সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত। কাজেই এর উদ্দেশ্যসমূহ লক্ষবিন্দুতে পৌছুতে সক্ষম হবে, এতে সন্দেহ নেই।

তাই আমরা বলবো: উদ্দেশ্যসমূহ দুধরনের। এক ধরনের উদ্দেশ্য স্রষ্টার সৃষ্টিগত এবং অন্যগুলো আইনগত।

সৃষ্টিগত উদ্দেশ্যাগুলো

সৃষ্টিগত উদ্দেশ্যসমূহ সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ কথার প্রমাণ আল্লাহর এ বাণী, 'আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।'[২৫] আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত রিসালাতের সাধারণ উদ্দেশ্য এটিই। কুরআনে এ সম্পর্কিত বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ 'আমি প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি, (যারা বলতো) আল্লাহর ইবাদত করো এবং আল্লাদ্রোহী শক্তিকে বর্জন করো।'[২৬]

আল্লাহ বলেছেন, 'আমি তোমার আগে এমন কোনো রসূল পাঠাইনি তার প্রতি এই অহী ছাড়া যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, কাজেই আমারই ইবাদত করো।'[২৭]

তিনি আরো বলেছেন, 'তোমার আগে আমি যেসব রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের তুমি জিজ্ঞেস করো, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া কোনো দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদত করা যায়?'[২৮]

এসব আয়াত এবং এগুলোর সমার্থবোধক অন্যান্য আয়াত এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদত করতে গেলে মাবুদের পরিচয় লাভ করতে হয়। কাজেই প্রথমেই আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে হবে। এটি প্রথম ওয়াজিব। এ দ্বারা যে প্রশংসনীয় লক্ষ অর্জিত হয় তা হলো মানবতার পূর্ণতা এবং মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ ও মুক্তি। এটাই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য। আর এ তাৎপর্যসহ মহান আল্লাহ রসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। এছাড়া আত্মসংশোধন ও পরিশুদ্ধি হয় না।[২৯]

যখন সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য হয় সৃষ্টজীব তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না তখন উদ্দেশ্যের ফলাফল উদ্দেশ্য পোষণকারীর দিকে আসতে বাধ্য নয়। এ কারণে আমরা যখন বলি, শরীয়ত প্রণেতা (আল্লাহ) ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তখন আমাদের এ কথা মনে করা উচিত নয় যে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা এবং কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করার ফলাফল সেই মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর দিকেই ফিরে যাবে। বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় কর্মসম্পাদনের ফলাফল যিনি কর্ম সম্পাদন করেছেন তার দিকে ফিরে যাবে। এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ বিশ্ব জাহানের কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা হলো, 'হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।'[৩০]

এ ধরনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। আর যদি এ ধরনের উদ্দেশ্য আসল হিসাবে সাব্যস্ত হয়, তাহলে এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার চাইতে চুপ থাকাই ভালো।

আইনগত উদ্দেশ্যাবলী

দ্বিতীয় ধরনের উদ্দেশ্য আইন প্রণেতার আইনগত লক্ষসমূহ। অর্থাৎ এমন চূড়ান্ত লক্ষ যা মানুষকে আল্লাহ প্রণীত আহকামের তত্ত্ব ও রহস্যের সন্ধান দিতে সক্ষম। এ কারণে শরীয়ত সাধারণ উদ্দেশ্য

প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পরিপূরক হয়। আর সে উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ সাধন করা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং মানবতার কল্যাণ ও পূর্ণতার সাথে দুনিয়াকে এমনভাবে পুনরগঠিত করা যাতে দুনিয়া যথার্থই আখেরাতের শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়।

এ কারণেই ইসলামের রিসালাত হচ্ছে হেদায়াত, রহমত, ইনসাফ ও অনুগ্রহ এবং চিরকাল তার এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কঠিন ও জটিলতার স্থলে সহজতা ও সরলতা প্রতিষ্ঠা এর লক্ষ। এভাবে সাধারণ লক্ষে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যেই শুরু থেকে শরয়ী বিধানের প্রবর্তন হয়। যেমন সংকীর্ণতা দূর করা, ক্ষতি ও অনিষ্টতা পরিহার করা, ইনসাফ ও পরামর্শ নীতি গ্রহণ করা, আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, অধিকার প্রদান করা, আমানত যথাযথ রূপে আদায় করা, দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সত্য ও বিশ্বস্ততার পথ অবলম্বন করা এবং এ ধরনের অন্যান্য মৌলিক বিধানসমূহ বাস্ত বায়নের জন্য আসমানী শরীয়তসমূহ প্রবর্তিত হয়েছে।

মানব জাতির একাধারে বর্তমান ও ভবিষ্যত কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই শরয়ী বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।[৩১] শায়খ ইবনে আশূর[৩২] বর্ণনা করেছেন, 'বর্তমান'-এর অর্থ হলো আখেরাতে নয় বরং এ দুনিয়ায় কাজের পরিণতি প্রত্যক্ষ করা। এ কথার প্রমাণ হিসাবে তিনি বলেছেন, শরীয়ত মানুষকে পরিণতি দেখার জন্য উৎসাহিত করেনি। মানুষ সত্বরই তা প্রত্যক্ষ করবে আখেরাতে। তবে আল্লাহ মানুষের আখেরাতের জীবনকে তার দুনিয়ার অবস্থার প্রেক্ষিতে তৈরি করে রেখেছেন। তাঁর ভাষায় : ভবিষ্যত বা 'আজল' -এর ব্যাখ্যা হলো, শরীয়ত সম্মত কষ্টসমূহ কখনো শুরু হয় দায়িত্ব প্রাপ্তদেরকে কষ্ট ও ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং কল্যাণ রহিত করার মধ্য দিয়ে। যেমন মদপান ও এর বেচাকেনা হারাম হওয়া। কিন্তু একজন সচেতন ব্যক্তি যখন এসব শরয়ী বিধান সম্পর্কে চিন্তা করে তখন তার কাছে পরিণামে এর কল্যাণকারিতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে 'আজল' বা ভবিষ্যতের এ ধরনের ব্যাখ্যা করলে তা থেকে কি আখেরাত না হওয়া বুঝায়? আসলে শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধন করা। কাজেই 'আজল'-এর অর্থ আখেরাত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

কারণ মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কল্যাণ সাধন করা। আর কল্যাণ হচ্ছে সৎ কাজের পরিণাম। সৎকাজের পরিণাম ফল কখনো দুনিয়াতে পাওয়া যায়। আবার এর পরিণাম ফল কখনো আখেরাতেও পাওয়া যায়। কাজেই এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, শরীয়ত মানুষের জন্য কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি। মানুষ আখেরাতে এগুলোর পরিণাম সত্বরই দেখতে পাবে। কাজেই শরয়ী বিধানের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করা।

তাই প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হবে দুনিয়াতেই। প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের পরিণাম ফল জাগতিক জীবনে লাভ করা জরুরী নয়। এ ব্যাপারে কুরআন বলে, 'কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ থেকে দূরীকৃত অবস্থায়।'[৩৩]

আল্লাহ বলেন, 'যারা মুমিন হয়ে পরকাল কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা চালায় তাদেরই প্রচেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।'[৩৪]
এসব আয়াত এ কথা প্রকাশ করে যে, আখেরাতের চেষ্টা-সাধনা শরয়ী বিধানের দাবী অনুযায়ী দুনিয়াতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এজন্য প্রচেষ্টাকারীকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহর দানের যোগ্য হতে হবে। শাতবী বলেন, 'শরয়ী বিধানের কল্যাণসমূহ বিধান পালনকারীর জীবনে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বার বার আসে একথা ঠিক।'[৩৫] এ পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যসমূহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের কল্যাণসমূহের দায়িত্ব বহন করে থাকে। আর এটা শরীয়ত প্রণেতার কল্যাণসমূহের সুস্পষ্টতা ছাড়া প্রাথমিক সিদ্ধান্তের তদারকী করতে নিষেধ করে না।

শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলী প্রমাণিত হওয়ার দলিল

বিভিন্ন দলিলের সাহায্যে শরীয়তের উদ্দেশ্য আছে এ কথা প্রমাণ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। যেমন নবীদের প্রেরণ করা, কুরআন হাদীস ভিত্তিক আহকামের উৎসসমূহ পাঠ করা এবং ইজমার সাহায্যে গৃহীত শরয়ী আলেমগণের সার্বিক নিয়মাবলী। কেননা শাখা প্রশাখা ও খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ এসব নিয়ম কানুনের ছত্রছায়ায় একত্র হয়ে যায়।
নবীদের প্রেরণ সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত আছে। এসব আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, নবী-রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে বান্দার প্রতি করুণা করা এবং সত্য ও ন্যায়ের দিক নির্দেশনা দেয়া। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাকে কেবল সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবেই পাঠিয়েছি।'[৩৬]
আল্লাহ আরো বলেছেন, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার প্রতিকার এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।'[৩৭]
আল্লাহ আরো বলেছেন, 'সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে।'[৩৮]
আল্লাহ আরো বলেছেন, 'এই কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও রহমত।'[৩৯]
উপরোক্ত আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, নবী-রসূলগণকে প্রেরণ করা বান্দার ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ারই নামান্তর। যে এ রহমত গ্রহণ এবং নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে সে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সৌভাগ্যশালী হবে। আর যে এ রহমত প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করবে সে দুনিয়ায় ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ ক্ষতি হবে অপূরণীয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 'তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করো না, যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে?'[৪০]
তিনি আরো বলেছেন, 'যে আমার সৎপথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ কষ্টও পাবে না। আর যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উঠাবো অন্ধ অবস্থায়।'[৪১]

আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, রসূলের অনুসরণের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ রয়েছে এবং তাঁদের বিরোধিতা করা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য অকল্যাণকর ও দূর্ভাগ্যজনক। কাজেই আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিলোক ও নির্দেশাবলীর মধ্যে যে উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করছেন সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষে তাঁর পক্ষ থেকে রসূল প্রেরণ করে থাকেন। এ থেকে এ কথা প্রমাণ হয় যে, বিধান প্রেরণের পেছনে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য রয়েছে।

প্রমাণপঞ্জি

১. সূরা নিসা, ১৬৫ নং আয়াত।
২. সূরা আম্বিয়া, ১০৭ নং আয়াত।
৩. সূরা ইসরা, ২ নং আয়াত।
৪. সূরা আলে ইমরান, ৩ ও ৪ নং আয়াত।
৫. সূরা ইবরাহীম, ১ নং আয়াত।
৬. সূরা ইসরা, ৯ নং আয়াত।
৭. সূরা আল বাকারাহ, ২ নং আয়াত।
৮. সূরা আনকাবুত, ৪৫ নং আয়াত।
৯. সূরা আল বাকারাহ, ১৮৩ নং আয়াত।
১০. সূরা তওবা, ১০৩ নং আয়াত।
১১. সূরা আল হজ্জ, ২৭ নং আয়াত।
১২. সূরা আল বাকারাহ, ১৭৯ নং আয়াত।
১৩. সূরা আল মায়েদাহ, ৯০ নং আয়াত।
১৪. আল মাওয়াফিকাত ২/৩। নিবরাসূল উকূল, পৃষ্ঠা ৩২৩-৩২৮। মাজমুআ রাসায়েল ফী উসূলিল ফিক্‌হ, ৬১২ দারুল কুতুব মিসর, পৃষ্ঠা ৫১। মাকাসিদুশ শারীয়াহ, শায়খ মুহাম্মদ আনিস উবাদাহ, পৃষ্ঠা ৯।
১৫. আল কামূসুল মুহীত, ৩ খণ্ড ২০৬ পৃষ্ঠা এবং আল মিসবাহুল মুনীর, ৯৮৩ পৃষ্ঠা।
১৬. আল গাযালী, শিফাউল গালীল, ১০৩ পৃষ্ঠা, ডক্টর হামদ উবাইদ, আল-কাইসী-এর তথ্যানুসন্ধান। আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, নিবরাসূল উকূল ৩২৩-৩২৮ পৃষ্ঠা। আল উস্তাদ আশ শাইখ মুহাম্মদ আনিস উবাদাহ, ৯ পৃষ্ঠা।
১৭. মুহাম্মদ মুস্তফা শিবলী, তা'লীমুল আহকাম, ২৮২-২৮৩ পৃষ্ঠা।
১৮. শিফাউল গালীল, ১০৩ পৃষ্ঠা, আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।
১৯. আল মাওয়াফিকাত, ৩ খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।
২০. সূরা আল ইসরা, ৩৩ নং আয়াত।

২১. সূরা আত তাকভীর, ৮-৯ নং আয়াত।
২২. সূরা আল আনআম, ১১৯ নং আয়াত।
২৩. আল মাওয়াফিকাত, ৩ খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।
২৪. আল মাওয়াফিকাত, ৩ খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।
২৫. সূরা আয্ যারিয়াহ, ৫৬ নং আয়াত।
২৬. সূরা আন নহল, ৩৬ নং আয়াত।
২৭. সূরা আল আম্বিয়া ২৫ নং আয়াত।
২৮. সূরা আয যুখরুফ, ৪৫ নং আয়াত।
২৯. ইবনুল কাইয়েম, মিফ্তাহু দারুস সা'আদাহ, ২ খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা, আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।
৩০. সূরা ফাতের, ১৫ নং আয়াত।
৩১. আল উস্তাদ শায়খ মুহাম্মদ আনিস উবাদাহ, মাকাসিদুশ শারীআহ, ৮-৯ পৃষ্ঠা।
৩২. তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মদ তাহের ইবনে আশূ। জামে আয্যাইতুনীয়ার শাইখ। তিউনিসের সমকালীন আলেমগণের অনেকেই ছিলেন তাঁর ছাত্র। তিনি 'মাকাসিদুশ শরীআতিল ইসলামিয়া' নামে কিতাব লেখেন এবং তা তিউনিসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক, সূক আত্তারীনের মাকতাবাতুল ইসতিকামাহ।
৩৩. সূরা আল ইস্রা ১৮ নং আয়াত।
৩৪. সূরা আল ইস্রা, ১৯ নং আয়াত।
৩৫. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, সাবীহতে প্রকাশিত।
৩৬. সূরা আল আম্বিয়া, ১০৭ নং আয়াত।
৩৭. সূরা ইউনুস, ৫৭ নং আয়াত।
৩৮. সূরা আন নিসা, ১৬৫ নং আয়াত।
৩৯. সূরা আল জাসিয়া, ২০ নং আয়াত।
৪০. সূরা ইবরাহীম, ২৮ নং আয়াত।
৪১. সূরা তা-হা, ১২৩-১২৪ নং আয়াত।

অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬
বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৫, পৃষ্ঠা : ১৯-২৪

বহু বিবাহ ও বর্তমান সমাজ

ড. হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

সমাজে বহু বিবাহ প্রথা একটি বহুল আলোচ্য বিষয়ে রূপ নিয়েছে, আবার এটাকে বিতর্কিত বিষয়ও মনে করা হয়। বহু বিবাহ কি? কখন থেকে এটার প্রচলন? এর বৈধতা এবং অবৈধতা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি এবং দেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইনে এর কার্যকারিতা কতটুকু? এসব বিষয় আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

বহু বিবাহ এর অর্থ হলো একজন স্ত্রীর বর্তমানে বা অবর্তমানে আরেকজনকে বিবাহ করা। এর দুটো পদ্ধতি প্রচলিত। এক, স্ত্রীর মৃত্যু অথবা তালাক প্রাপ্ত হবার পর আরেকজনকে বিবাহ করা। দুই, স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিশেষ প্রয়োজনে একের বেশি বিয়ে করা।

ইতিহাসের আলোকে একাধিক স্ত্রীর প্রথা ইসলামের আগমনের বহুপূর্ব থেকে চলে এসেছে। আরবদের মধ্যে এর প্রচলন ছিল তুলনামূলক বেশি। একাধিক স্ত্রী রাখার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন বিধি-বিধান ছিল না। তার কোন বাধ্যবাধকতাও ছিল না। বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইহুদী, খ্রীস্টান, আর্য, হিন্দু এবং পার্সিকদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা বিদ্যমান ছিল।[১] সেই সঙ্গে স্ত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হত বেশি। এতীম মেয়েদের লালন পালনের নামে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন ও কুক্ষিগত করার জন্য তাদের স্ত্রী বানিয়ে অথবা দাসী বানিয়ে রাখা হত। কিন্তু ইসলাম এসে বহু বিবাহ প্রথাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে এবং এ ব্যাপারে কার্যকর বিধান সাব্যস্ত করে। বহু বিবাহের ছড়াছড়ি নিয়ন্ত্রণ করে নারী নির্যাতনের অবসান ঘটায়। সেই সাথে তাদের বঞ্চিত অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

কুরআন মজিদে নারী নামকরণকৃত সূরার (নিসা) সূচনা করা হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। কেননা তৎকালীন সময়ে নারীদের অধিকার হরণ এবং বিশেষত বহু বিবাহের দ্বারা তাদের সম্পদ আত্মসাত করা হত। তাদের উপর দৈহিক ও মানসিক নিপীড়ন চলত। সূরার সূচনায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয়, তাদের ব্যাপারে পুরুষদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বিবাহের ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করা হয়। তাদের অধিকার নষ্ট, ছলনা-চতুরতার দ্বারা তাদের ধন সম্পদ কুক্ষিগত করার ব্যাপারে আল্লাহর কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়।

বহু বিবাহ বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। যেমনটি কুরআনের উল্লেখিত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়। বরং প্রয়োজন ও পরিস্থিতির তাড়নায় এটা বৈধ হতে পারে। তবে এর সাথে শর্ত যোগ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে একের অধিক স্ত্রীদের সাথে ইনসাফভিত্তিক আচরণ করা। অর্থাৎ স্ত্রীদের মৌলিক অধিকার তথা

লেখক : প্রধান, দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

খাওয়া, পরা, বাসস্থান ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাম্য কায়েম রাখা। যদি এমন করতে অপারগ হয় অথবা সাম্য বজায় না রাখার আশঙ্কা থাকে তবে একজন স্ত্রীই যথেষ্ট মনে করতে হবে। একাধিক স্ত্রী রাখায় বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়, তবে আদল ও ইনসাফটি বাধ্যতামূলক। ইনসাফের সীমানা লংঘন করার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহর নবী স. বলেছেন, 'স্ত্রীদের সাথে ইনসাফ করতে ব্যর্থ স্বামীরা কিয়ামতের মাঠে বিকলাঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত হবে।'[২]

হাশরের দিন এমন ব্যক্তির এ অবস্থাই প্রমাণ করে যে স্ত্রীদের সাথে অন্যায় ব্যবহারের শাস্তি এরূপ। কোন কোন ফিকাহবিদ বহু বিবাহকে বাধ্যতামূলক বলেছেন। তাদের সংখ্যা কম। তাদের যুক্তি হচ্ছে কুরআনের অপর আয়াতে বিয়েকে সামর্থের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।[৩] অর্থাৎ সামর্থ থাকা অবস্থায় এবং প্রয়োজনে একের অধিক বিবাহ করা আবশ্যিক। এ মতটি দুর্বল বলে অধিকাংশের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। বহু বিবাহের ব্যাপারে ইসলামের আরেকটি বিধান হচ্ছে চারজনের অধিক বিবাহ নিষিদ্ধ। কুরআনের সূরা নিসা এর প্রথমাংশটি নাযিল হবার পর একজন সাহাবী নবীর স. দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, এতদিন যাবত আমার অধীনে দশ জন স্ত্রী আছে, এখন আমার কি করণীয়? তিনি তাকে বললেন, তোমার জন্য চার জন বৈধ। অতএব তাদের মধ্য থেকে যে কোন চারজনকে রেখে বাকীদের বিদায় করে দাও।' এখানে এও স্মরণীয় যে নবীর জন্য চারের অধিক স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে বিশেষ অনুমতি ছিল। কিন্তু এটা ছিল বিশেষ কারণে; মানবতার বিশেষ তাগিদে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিকতার প্রয়োজনে। যেটা উল্লেখ করতে হলে বহু পৃষ্ঠার প্রয়োজন।[৪]*

বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

বহু বিবাহের ব্যাপারে এককালে অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল। ইসলাম এসে তাকে সুশৃংখল ও নিয়মতান্ত্রিক করেছে, তা না হলে সমস্যা সমস্যাই থেকে যেত। নির্ঝঞ্ঝাট সমাজ ও নিষ্কলুষ জীবনই ইসলামের কাম্য। যে সমাজে নারীর সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেশি, যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে যে সমাজের বেশির ভাগ পুরুষ নিহত, নারী পুরুষের অবাধ মিলনের ফলে যে সমাজের লোকেরা স্ত্রী হারা বাপ অথবা স্বামী হারা মাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়, যে সমাজের লোকেরা মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত শিশুদের লালন পালনের ব্যাপারে উদাসীন, সে সমস্ত সমাজে বহু বিবাহ প্রথার বিশেষ প্রয়োজন। জার্মানীতে এক সময় বহু বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু সামাজিক পর্যায়ের নানাবিধ সমস্যার কারণে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপুল সংখ্যক পুরুষের নিহত হবার এবং মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চাইতে অনেক বেড়ে যাবার ফলে সেটাকে আবার বৈধ করা হয়। সে দেশের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা বলেন, 'জার্মানীর বর্তমান সমস্যার সমাধান সম্ভব একাধিক বিবাহের দ্বারা। একজন ব্যর্থ স্বামীর স্ত্রী হওয়ার চেয়ে একজন সামর্থবান স্বামীর একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে বাস করা আমার জন্য অনেক ভালো। এটা কেবল আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি নয়, বরং আমার মতে প্রায় সব জার্মান মেয়েদের একই উপলব্ধি।'[৫] বহু বিবাহ প্রথাটি কখনো কখনো সুখী পারিবারিক জীবনের জন্য অপরিহার্য। পাশ্চাত্যের বহু নারী এখন এটা উপলব্ধি করছেন। এর একটি বাস্তব উদাহরণ, ইহুদী ধর্ম থেকে ইসলামে দীক্ষিত আমেরিকান মরিয়ম জামিলা। তিনি তাদেরই মধ্যকার

---

* এ সংখ্যায় 'বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ স. এর বহু বিবাহঃ একটি পর্যালোচনা' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। -সম্পাদক

একজন যারা বহু বিবাহের জোরালো সমর্থক। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বেচ্ছায় এমন একজনকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন যিনি একজন স্ত্রী ও একাধিক সন্তান নিয়ে সংসার করে আসছেন।[৬] জার্মানীর আইনে একাধিক বিবাহ মানবতা বা নৈতিকতার পরিপন্থী নয়।

বহু বিবাহ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

যেমন : এক. স্ত্রীহারা স্বামী। অর্থাৎ যার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছেন, অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ হবার কারণে স্বামী অন্য বিবাহ করতে পারবেন। নিজের সেবা যত্ন বা নিজ শিশু সন্তানদের মাতৃস্নেহ দেয়ার জন্য যদি তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন, তাতে কোন বাধা নেই। দুই. দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত স্ত্রীর কারণে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবেন। অর্থাৎ এমন ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রী, যার সুস্থ হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। অথবা তিনি বন্ধ্যা, মানসিক ভারসাম্যহীন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার স্বামী আরেকজনকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করতে পারেন। তিন. সমাজের মধ্যে যদি এমন বিধবা বা তালাক প্রাপ্ত মহিলা থাকেন যারা অবহেলিত, অসহায়, এতীম সন্তানদের নিয়ে কঠিন জীবন-যাপন করছে, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের লক্ষে তাদের বিবাহ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এটা বৃহত্তর মানবতার দাবীও বটে। চার. বদমেজাজ ও রুক্ষ স্বভাবের স্ত্রীর আচরণের কারণে দ্বিতীয় বিবাহ ছাড়া অনেকের উপায় থাকে না। পাঁচ. কোন স্বামী নিজের দৈহিক প্রয়োজনে একের অধিক বিবাহ করতে চাইলে ইসলামের বিধানে নিষেধ নয়। ছয়. সন্তান ও বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ে করা যেতে পারে। সাত. সমাজে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার তুলনায় বেশি হবার কারণে ব্যভিচার থেকে তাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে একাধিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এগুলো ছাড়া বহু বিবাহের বৈধতার আরো বহু কারণ থাকতে পারে। কুরআনে উল্লেখিত দুটি শর্তের ভিত্তিতে এই বহু বিবাহ সম্ভব।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে বহু বিবাহ

এ ব্যাপারে আমাদের সমাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

ক) উপরোল্লিখিত প্রয়োজনের তাগিদে এবং সেই সাথে ইসলামের শর্তসাপেক্ষতা সত্ত্বেও বহু বিবাহকে কটু দৃষ্টিতে দেখা হয়। এমনকি এই পথে বহু ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। স্ত্রী-পরলোকগত স্বামী নিজের প্রয়োজনে আবার বিয়ে করতে চাইলে সন্তান অথবা আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকে নানা বাধা সৃষ্টি করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পিতাকে দৈহিক ও মানসিক শাস্তি দেয়া হয়। ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। অথচ একজন স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু সেটা কেবল তিনি উপলব্ধি করেন যিনি আপন স্ত্রীকে হারিয়েছেন। অথচ এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়, এখানে হস্তক্ষেপ কাম্য হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ প্রদত্ত দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার জোরপূর্বক খর্ব করা মহা অন্যায়। তৃতীয়ত, পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তাকে নিপীড়নের লক্ষ বানানোর মত অন্যায় অমার্জনীয়।

খ) সমাজে আরেক শ্রেণীর লোক আছে যারা স্ত্রীকে কেবল সম্ভোগের জন্য ব্যবহার করে। স্ত্রী যে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী, সংসারের সৌন্দর্য, পারিবারিক শান্তি সেটা উপলব্ধি করতে চায় না। সাধারণ পণ্য হিসাবে তারা নারীদের বিয়ে করে। কিছু দিন ভোগ করার পর তাদের ছুড়ে মারে।

আবার আরেকজনকে শিকার বানায়। কিছু লোক অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে বহু বিবাহ করে। কিছু লোক প্রথম স্ত্রীকে মানসিক শাস্তি এবং 'উচিত শিক্ষা' দেয়ার জন্য বহু বিবাহ করে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোক প্রথম স্ত্রীর অজান্তে অথবা আত্মীয় স্বজনকে না জানিয়ে অন্য শহরে গিয়ে বিয়ে করে। এ ধরনের আরো বহু কারণে লোকেরা বহু বিবাহ করে। যা কুরআন হাদিসের শাশ্বত বিধানের পরিপন্থী। এটা সামাজিক অপরাধ এর প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা প্রয়োজন। গ) আমাদের সমাজে আরেকটি প্রথা প্রচলিত, যাকে মূর্খতা বা বৈরাগ্য বলা যায়। সেটা হল বিধবা অথবা তালাক প্রাপ্ত মহিলাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা। মৃত স্বামীর স্ত্রীদের বল-পূর্বক সাদা কাপড় পরার জন্য বাধ্য করা। তাদেরকে অলঙ্কারাদি মুক্ত রাখা, ঘরের চার দেয়ালের বাইরে যেতে নিষেধ করা, তাদেরকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা ইত্যাদি। অথচ অন্য মহিলাদের মত তাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার এবং পছন্দের পুরুষের সাথে পুনরায় বিয়ে করার। মৃত স্বামীর জন্য শরীয়ত সম্মত ইদ্দত অতিক্রম করার পর, বা তালাকের ইদ্দত পালনের পর তারা নিজেদের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার রাখে। তাদেরকে অন্যত্র বিবাহ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখার মানে তাদের উপর জুলুম করা এবং সমাজের মধ্যে অন্যায় ও ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেয়া, যেটা সমাজ তথা দেশের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। এ সকল প্রেক্ষিতে বহু বিবাহ নারীদের স্বার্থের অংশ বিশেষ। ইসলামের অগণিত অবদানের মধ্যে এটা অন্যতম। বহু বিবাহের দ্বারা বিধবা মহিলাগণ নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেন। আদর্শ স্বামীর স্নেহ, মমতা ও ভালবাসার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। অন্যদের মত তাদেরও মা হবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। তারাও চান অন্ধকার ও বর্বরতার নাগপাশ থেকে বের হয়ে সাধারণ নাগরিকের ন্যায় সুখে জীবন কাটাতে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে স্বামী-বিচ্ছিন্ন এবং অবিবাহিত নারীরা আজ সমাজের তথা রাষ্ট্রের জন্য বড় ধরনের সংকট হয়ে আছে, যার সমাধান সম্ভব হয়ে উঠছে না। কিন্তু ইসলাম এর যথাযথ সমাধান দিতে পেরেছে।

মুসলিম পারিবারিক আইন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট

বলাবাহুল্য, ইসলাম অনুমোদিত একাধিক বিবাহ নীতির অপব্যবহার, অপব্যাখ্যা এবং এরই ফলশ্রুতিতে নারী নির্যাতন, তাদের সাথে প্রতারণামূলক আচরণ রোধের জন্য ১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশটি জারী করেন। যা আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে এখনো বলবত রয়েছে। বিবাহ, তালাক ইত্যাদির সবটাই এখনও একই অধ্যাদেশের আওতায় চলছে। সমাজে উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে হয়ত এ অধ্যাদেশের প্রয়োজন হত না। কিন্তু অধ্যাদেশের মধ্যে দুটি ধারার এমন কিছু বিষয় রয়েছে ইসলামী আইন বিধানের আলোকে যার সংশোধন জরুরী। প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়টি দীর্ঘ হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় এখানে কেবল বহু বিবাহের অধ্যাদেশের বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।

বহু বিবাহ (Polygamy) সংক্রান্ত মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ১ নং ধারায় উল্লেখিত হয়েছে যে, সালিশী পরিষদের লিখিত পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি একটি বিবাহ

বলবত থাকলে আরেকটি বিবাহ করতে পারবে না এবং পূর্ব অনুমতি গ্রহণ না করে এ জাতীয় কোন বিবাহ হলে তা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ অনুসারে রেজিস্ট্রি হবে না। আইনে উল্লেখিত ধারায় সালিশী পরিষদের কাছ থেকে অনুমোদনের বিষয়টি ইসলামের বিধান বহির্ভূত। কারণ দ্বিতীয় বিবাহ করা বা না করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার স্বামীর অথবা বিধবা ও তালাক প্রাপ্ত মহিলার। অন্য কোন ব্যক্তির এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তবে সিদ্ধান্ত কার্যকারিতার ব্যাপারে আদালত অথবা শালিশী পরিষদের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত সমাজের মধ্যে দ্বিতীয় বা একাধিক বিয়ের সুযোগে প্রচলিত কু-সংস্কার তথা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সেই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখী করার লক্ষে দ্বিতীয় বিবাহের সময় প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণটি আইনের আওতায় করা যেতে পারে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'মুসলমানগণ যে কোন ব্যাপারে শর্ত দিয়ে কাজ করতে পারে, তবে হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করার মত কোন শর্ত দেয়ার অধিকার রাখে না।' ওকবাহ বিন আমের রা. বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর নবী স. বলেন, 'বিয়ের সময় স্ত্রীকে বৈধরূপে গ্রহণ করতে গিয়ে যে শর্তই রাখা হয় সেটা পালন বা কার্যকর করা জরুরী।' (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ) হাদিস দুটি উল্লেখ করে তাইসিরুল আল্লাম.... এর গ্রন্থকার বলেন, বিয়ের ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই যে কোন লক্ষ ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে এমতাবস্থায় একজন অপর জনের প্রতি কোন শর্ত দিয়ে থাকলে সেটা কার্যকর করা উচিত। তবে সে শর্তটি যেন দাম্পত্য জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূলে হয়।[৭] যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে না করার শর্ত প্রদান করে অথবা দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার শর্ত দেয় তাহলে সেটা বৈধ। এমতাবস্থায় স্বামী যদি সেই শর্ত লংঘন করে তাহলে স্ত্রীকে নিজেদের বিয়ে ভঙ্গ করার স্বাধীনতা দেয়া হবে। এক লোক স্ত্রীকে বাসস্থান দেয়ার শর্তে বিয়ে করেন কিন্তু তিনি শর্তটি রাখতে ব্যর্থ হলে খলীফা ওমরের রা. নিকট বিচার প্রার্থনা করা হয়। ওমর রা. বললেন, শর্ত অনুযায়ী তার (স্ত্রীর) প্রাপ্য সঠিক।[৮] ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম এবং অন্যান্য ওলামা এ মতের বিপরীত রায় প্রকাশ করেছেন। সমর্থনে তাঁরা আবু হুরাইরা রা.-এর একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. কোন স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার শর্ত দিতে নিষেধ করছেন।[৯] আমাদের বর্তমান সমাজের অবস্থার প্রেক্ষিতে খলীফা ওমরের সিদ্ধান্ত ও তার সমর্থনে উল্লেখিত হাদিসটিকে আমল দেয়া যেতে পারে।[১০] এখানে একটি বিষয় জানা থাকা দরকার, সেটা হল এই যে, দ্বিতীয় বা ততোধিক বিয়ের প্রয়োজনীয়তা কার জন্য কার্যকর ও কার জন্য কার্যকর নয় সেটা চিহ্নিত করার জন্য দেশের আদালত অথবা সরকার নিয়ন্ত্রিত সমাজ কল্যাণ দপ্তরের বিজ্ঞ কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় বিবাহের কারণে প্রথম স্ত্রীর অধিকারের কোন ক্ষতি হবার আশংকা থাকছে কি না সেটাও উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ নির্ধারণ করবেন। সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোনটা ও লাভজনক কোনটা সরকারের উচিত তার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা। দ্বিতীয় বা একাধিক বিবাহ মোবাহ (ঐচ্ছিক) ব্যাপার। এটাকে ঢালাওভাবে অবৈধ সাব্যস্ত করা যাবে না। এই মোবাহকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি শর্ত জড়িত।

ক) প্রয়োগের বিশেষ কারণ এবং সেটা শরীয়ত সম্মত কিনা সেদিকে লক্ষ রাখা।
খ) উক্ত প্রয়োগ যেন জুলুম বা বৈষম্যে পরিণত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কুরআনের এ দুটো শর্ত পালন করা হচ্ছে কিনা সেটার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। শর্ত পালনের অঙ্গীকারের পরও যদি কোন স্বামী সেটা লংঘন করে, বা নারীর ক্ষতি সাধন করে, অথবা নারীর উপর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর দণ্ড বিধান কার্যকর করা উচিত। যেমনটা আইনের পাঁচ নম্বর উপধারায় উল্লেখিত আছে। এই উপধারার 'ক' এবং 'খ'-এর যে শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে সেটা আরো কঠোর করে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং বিশ হাজার টাকা জরিমানা সাব্যস্ত করা যেতে পারে। সেই সাথে দোষী ব্যক্তিকে প্রতারণা বা চিটিং এর অপরাধের জন্য প্রচলিত দণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে।
দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে বিয়ে তালাক ইত্যাদির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সমাজের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এ জন্য মুসলিম পারিবারিক আদালত গঠন করা দরকার। যার অধীনে বিয়ে শাদী এবং এ জাতীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড চলতে থাকবে। আইনের এক নম্বর উপধারায় উল্লেখিত সালিশী পরিষদটি ঐ আদালতের অধীনে করে দিলে এ সম্পর্কিত শরীয়তের বিধানটি সঠিকভাবে কার্যকর করা সম্ভব হবে।
মোট কথা হল, বহু বিবাহ সংক্রান্ত আইনটি যেন কুরআনের বিধানের পরিপন্থী না হয়, সেই সাথে বহু বিবাহের নামে সমাজে পরিব্যাপ্ত অপরাধ ও কুসংস্কার বন্ধ করতে হলে প্রবন্ধে উল্লেখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনায় আনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি।

প্রমাণপঞ্জি

১. তাফসীর মাআরিফুল কুরআন পৃঃ ২৩০।
তাফসীর আয়াতুল আহকাম পৃঃ ৪২৮।
তাফহীমুল কুরআন সূরা নিসা/ ২য় খণ্ড।
২. বুখারী ও মুসলিম।
৩. সূরা নিসা/২৫।
৪. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন সাফওয়াতুত তাফাসীর ১ম খণ্ড।
৫. মিসরের বিখ্যাত দৈনিক আল-আখবার, সংখ্যা-৭২৩, সন-১৯৮২।
অনুরূপ জার্মানীর দৈনিক ফ্রানকফুর্টের ৩রা মে, ১৯৮৫ ইং পৃঃ ৭।
৬. ইসলাম দি অল্টারনেটিভ: ডঃ মুরাদ হফম্যান, অধ্যায় ১৬, পৃঃ ২০১।
৭. তাইসিরুল আল্লাম, পৃঃ ৭৭৫, খণ্ড-৭।
৮. দেখুন : আল সালসাবিল পৃঃ ৬-৭, খণ্ড ২।
৯. ঐ
১০. দেখুন বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে রুশদ, পৃঃ ৫৯, খণ্ড-২।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬
বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৫, পৃষ্ঠা : ২৫-৬০

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ স. এর বহুবিবাহ ঃ একটি পর্যালোচনা

আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ স. পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহামানব। মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বোৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলী প্রদান করে সর্বশেষ রসূল হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আল-কুরআনে তাঁর উন্নত চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর সু-প্রতিষ্ঠিত।[১]

যুগে যুগে অসংখ্য মনীষী, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, দার্শনিক ও জ্ঞানী-গুণী মহানবী স.-এর উন্নত চরিত্র ও উৎকৃষ্ট গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে মানব জাতির ইতিহাসের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মর্যাদা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে মাইকেল এইচ হার্টের উক্তি উল্লেখযোগ্য- My choice of Muhammad to lead the list of the worlds most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels...........It is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel intitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history.[2]

'বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে আমি মুহাম্মদের নাম সর্বশীর্ষে নির্বাচিত করেছি। এতে কেউ কেউ বিস্মিত হতে পারে এবং কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় ক্ষেত্রেই একযোগে সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করেছেন।...........এটিই হচ্ছে অতুলনীয় সেই ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় সমন্বয়ের (সুদূরপ্রসারী) প্রভাব যার জন্য মুহাম্মদকে আমি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী একক ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত করেছি।'

কিন্তু অতীব দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পাশ্চাত্যের কতিপয় জ্ঞানপাপী, ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মযাজক শত্রুতাবশত মহানবী স. ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুগে যুগে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা অপপ্রচার

লেখক : এম. ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

চালিয়েছে। মানব জাতির ইতিহাসে অন্য কোন নবী বা ধর্মমতের বিরুদ্ধে এতো বেশি অপপ্রচার চালানো হয়নি। এর কারণ-আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এই দীন থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়া। এ উদ্দেশ্যে তারা মহানবী স.-এর বহুবিবাহের বিষয়টি নিয়ে ঘৃণ্য সমালোচনা করেছেন। এসব সমালোচনাকারীদের মধ্যে উইলিয়াম মুর, মার্গালিউদ, লামিন্স, এলওয়াস স্প্রিঙ্গার, অরফ্যাঞ্জ, ডারমিংহোম ও গোল্ডজিহারের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব ইসলাম বিদ্বেষী জ্ঞানপাপীদের মতে-মুহাম্মদ স. একজন নারী লিপ্সু। তারা বলেন, তিনি একজন মুসলমানের জন্য শর্তসাপেক্ষে সর্বোচ্চ চারটি বিবাহের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে নিজে এই সীমা লংঘন করে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি পালক পুত্রের স্ত্রীকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজে বিবাহ করেছেন। মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল প্রাচ্যবিদদের বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেছেন- Muhammad who in Makkah called men to asceticism and contentment, to monotheism and abstinence from the pleasures of this life, has now become a man of lust whose appetite every woman could whet. He is not satisfied with three women whom he has so far taken into marriage but has now taken the three additional wives just mentioned. Indeed, he was to marry three more ....He fell in love with Zainab, daughter of Jahash, while she was wife of Zayd Ibn Harithah, his own client.[3]

'মুহাম্মদ তাঁর মক্কার জীবনে অত্যন্ত কৃচ্ছ্রতার পরিচয় দেন। আল্লাহ প্রীতির দরুন তিনি মহিলাদের প্রতি চোখ তুলে তাকাতেন না। কিন্তু হিজরতের পরবর্তী জীবনে তাঁর এই স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে। তিনি পূর্বে তিনজন মহিলার পানিগ্রহণ করা সত্ত্বেও আরও তিনজনকে বিবাহ করেন। এ সময় তিনি শুধু বিধবাদেরই বিবাহ করেননি, অন্যের স্ত্রীদের তাদের স্বামী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজে বিবাহ করা শুরু করেন। তার প্রমাণ যায়নাব বিনতে জাহাশ, যিনি ছিলেন তাঁর ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারেছের স্ত্রী।'

তারা আরও বলেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সে অল্প বয়স্কা আয়শা রা.-কে বিবাহ করে একদিকে বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে ১৮ বছর বয়সে বিধবা রেখে তার প্রতি জুলুম করেছেন।

এভাবে তারা মহানবী স.-এর বিবাহগুলোর প্রকৃত কারণ আড়াল করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সমালোচনার মাধ্যমে তাঁর উন্নত চরিত্রকে কলংকিত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। এ বিষয়ে আজও তাদের অপচেষ্টা অব্যাহত আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মহানবী স.-এর বহু বিবাহের বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক পাশ্চাত্য সমালোচকদের অপপ্রচারের জবাব এবং তাঁর বিবাহগুলোর প্রকৃত কারণ তুলে ধরার চেষ্টা করব।

মহানবী স. এর উন্নত নৈতিক চরিত্রের কয়েকটি প্রমাণ

এ কথা সুস্পষ্ট যে, মহানবী স. আইয়্যামে জাহেলিয়াতের এমন এক কলুষিত, বিপর্যস্ত ও অধঃপতিত সমাজে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে অবৈধ প্রণয়, ব্যভিচার,মদ ও জুয়ার মত বিষয়গুলো কোন অন্যায় বলে বিবেচিত হতো না। সেখানেই তিনি তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সীরাত গ্রন্থকার ও ঐতিহাসিক প্রমাণ করতে পারেননি যে, তিনি বিবাহ পূর্ব জীবনে কখনও একটি নৈতিকতা বিরোধী কাজ করেছেন অথবা কোন নারীর প্রতি কখনও প্রলুব্ধ ছিলেন। বরং সকল সীরাত গ্রন্থকার ও ঐতিহাসিক এ কথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি সত্যবাদিতা, বিনয়পূর্ণ আচরণ, পবিত্র স্বভাব ও মহৎ চরিত্রের জন্য নবুয়ত লাভের পূর্বে মক্কার ছোট-বড় সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তাঁর সততা ও অসাধারণ মহৎ চরিত্রের জন্য মক্কার সর্বসাধারণ যৌবনে তাঁকে আল-আমীন (বিশ্বাসী) উপাধী দিয়েছিল।

মহান আল্লাহ মহানবী স.-কে ছোটবেলা থেকেই পবিত্র রাখেন। এর একটি প্রমাণ-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন- 'যখন কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণের জন্য কাজ শুরু হয় তখন নবী স. ও আব্বাস রা. পাথর বহন করে আনার জন্য যান। তখন (তাঁর পরনে লুঙ্গি ছিল) আব্বাস রা. নবী স.-কে বললেন, তোমার লুঙ্গিটা খুলে কাঁধের উপর বেঁধে নাও, এতে পাথরের ঘর্ষণ থেকে রক্ষা পাবে। তিনি তা করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। এরপর তাঁর চক্ষুদ্বয় আকাশের দিকে উঠানো ছিল। হুশ ফিরে পেয়ে তিনি বললেন, আমার লুঙ্গি? আমার লুঙ্গি? এরপর তাঁকে লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হল।' সে দিনের পর আর কখনও তাঁকে আবরু উন্মুক্ত অবস্থায় দেখা যায়নি।'[৪] তাছাড়া সীনা চাক (বক্ষবিদীর্ণ) এর মাধ্যমে তাঁর থেকে সকল মানবীয় খারাপ স্বভাবগুলো দূর করা হয়।

নবুয়ত লাভের পর মহানবী স. মক্কাবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিলে অল্প ক'জন ব্যতীত সকলেই তাঁর চরম শত্রুতে পরিণত হয়। তারা তাঁকে পাগল, যাদুকর, কবি ও গণক ইত্যাদি বলে অভিহিত করে। কিন্তু তিনি এতই উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, চরম শত্রুদের কেউই তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করতে পারেনি। Bosworth smith বলেন, The contemporaries of Mohammed, his enemies who rejceted his mission, with one voice, extol his piety, his justice, his veracity, his clemency, his humility.[5]

'মুহাম্মদের সমসাময়িক লোকেরা তাঁর ধর্মকে প্রত্যাখান করেছিল। কিন্তু তারা এক বাক্যে তাঁর ধর্মনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমাশীলতা ও নম্রতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।'

মহানবী স.-এর চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব তৎকালীন কুরাইশ ও কাফের নেতৃবৃন্দ স্বীকার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সিরিয়ায় বাণিজ্যে গেলে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে কুরাইশদের একদল লোকের সাথে দরবারে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে সম্রাট

মহানবী স. সম্পর্কে আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেন যে, 'তিনি যা বলেছেন, এসব বলার আগে কেউ কি তাঁকে মিথ্যা বলার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। আবু সুফিয়ান উত্তরে বলেন, জী না'। এরপর হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করেন, 'তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেন।' আবু সুফিয়ান উত্তরে বলেন-জী না।'[৬]

সকল সীরাত গ্রন্থে এসেছে যে, ইসলাম প্রচার চিরতরে স্তব্ধ করার জন্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মহানবী স.-কে প্রস্তাব দেয়, হে মুহাম্মদ, যদি তুমি এখন থেকে তোমার নতুন ধর্মমত প্রচার বন্ধ কর তবে বিনিময়ে তোমাকে আরবের বাদশাহী, ধন-সম্পদ ও আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারী প্রদান করা হবে। প্রতি উত্তরে নবী স. বলেছিলেন, 'যদি তোমরা আমার এক হাতে সূর্য অন্য হাতে চন্দ্র এনে দাও তবুও আমি সত্য প্রচার থেকে বিরত হব না।' একজন ইন্দ্রিয়পরায়ণ-নারীলিপ্সু ব্যক্তি এরূপ সুন্দরী নারী, বাদশাহী ও ধন-সম্পদ লাভের সুযোগ এভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

মহানবী স.-এর নবুয়ত লাভের পর অনেক সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী নারী উভয় জাহানের মুক্তি লাভের আশায় তাঁর নিকট এসে স্বেচ্ছায় বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাদের সে সব প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। আনাস রা. বলেন, জনৈকা মহিলা নবী স.-এর কাছে এসে নিজেকে পেশ করে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে? আনাসের কন্যা বললো, সেই মহিলা কতই না নির্লজ্জ ছিল, ছিঃ লজ্জা। আনাস রা. বলেন, সে তোমার চেয়ে উত্তম। নবী স.-এর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল, তাই সে নিজেকে তাঁর কাছে পেশ করেছে।'[৭]

এরূপভাবে অনেক মহিলা বিবাহের জন্য নিজেকে স্বেচ্ছায় রসূল স.-এর নিকট পেশ করেন। কিন্তু রসূল স. সে সব মহিলার কাউকে বিবাহ করেননি। এ সম্পর্কিত অনেকগুলো হাদীস সিহাহ সিত্তাহ-এর 'কিতাবুন নিকাহতে বর্ণিত আছে।

মহানবী স. যদি নারী লিপ্সু হতেন তবে তাঁর জন্য জীবন ও সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত হাজার হাজার সাহাবীর যুবতী, সুন্দরী কন্যা বা বোনদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। আর এক্ষেত্রে সাহাবীগণও রসূল স.-কে তাদের কন্যা বা বোন বিবাহ দেয়াকে বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন। কারণ, সাহাবীদের নিকট মহানবী স.-এর চেয়ে অধিক প্রিয় কেউ ছিল না। কিন্তু তিনি নারী লিপ্সু ছিলেন না এ জন্যই তা করেননি।

প্রকৃত পক্ষে মহানবী স. তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজা রা.-এর মৃত্যুর পর জীবনের শেষ তের (৫০-৬৩) বছরে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে দশজন স্ত্রী গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে পি কে হিট্টি বলেছেন- Some for love, other for political reasons, he took about a dozen wives.[৮]

'করুণাজনিত ও রাজনৈতিক কারণে সব মিলিয়ে তাঁর বারজন স্ত্রী ছিল'। তাঁর এসব বিবাহের পিছনে বেশ কিছু মহৎ উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ছিল, যা নিম্নের পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হবে।

একনজরে মহানবী স. এর স্ত্রীদের তালিকাঃ

ক্রঃনং	স্ত্রীর নাম	বিধবা/কুমারী	বিবাহের সময় স্ত্রীর বয়স	বিবাহের সময় মহানবী স.-এর বয়স
১.	হযরত খাদীজা রা.	বিধবা	৪০	২৫
২.	হযরত সাওদা রা.	বিধবা	৫০ উর্ধ	৫১/৫২
৩.	হযরত আয়েশা রা.	কুমারী	৭/৯	৫২/৫৪
৪.	হযরত হাফসা রা.	বিধবা	১৯/২০	৫৬
৫.	হযরত যায়নাব রা. বিনতে খুজাইমা	বিধবা	৩০	৫৬/৫৭
৬.	হযরত উম্মে সালামা রা.	বিধবা	২৮/৩০	৫৭
৭.	হযরত যায়নাব রা. বিনতে জাহাশ	তালাকপ্রাপ্তা	৩৫/৩৮	৫৮
৮.	হযরত জুয়াইরিয়া রা.	বিধবা	২০	৫৯
৯.	হযরত উম্মে হাবিবা রা.	বিধবা	৩৮	৬০
১০.	হযরত সফিয়া রা.	বিধবা	১৭	৬০
১১.	হযরত মায়মুনা রা.	বিধবা	৫১	৬০
১২.	হযরত রায়হানা রা.	বিধবা	৩৮/৪১	৬০
১৩.	হযরত মারিয়া রা. (দাসী)	বিধবা	অজ্ঞাত	৬০

এ পর্যায়ে মহানবীর স. বৈবাহিক জীবনের ঘটনা প্রবাহ উল্লেখপূর্বক তাঁর বিবাহগুলোর প্রকৃত কারণ ও তাৎপর্য নিরূপণ করা হল।

১. হযরত খাদীজা রা.

হযরত খাদীজা রা. ছিলেন মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলা। যিনি জাহেলী যুগে উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের জন্য মক্কাবাসী কর্তৃক তাহিরা (পূত-পবিত্র) উপাধি লাভ করেন। মহানবী স.-এর সাথে বিবাহের পূর্বে তার দু'জনের সাথে বিবাহ হয় এবং দু'খানেই তিনি বিধবা হন। এই দু'স্বামীর ঘরে তার তিন জন সন্তানও জন্ম লাভ করে। দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দীর্ঘদিন বিধবা ছিলেন। এ সময় মক্কার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। যৌবনে মুহাম্মদ স.-এর চারিত্রিক খ্যাতি মক্কায় ছড়িয়ে পড়লে খাদীজা তাঁকে তার ব্যবসার পরিচালক নিযুক্ত করেন। এ সময় মুহাম্মদ স. এর সততা, আমানতদারী ও উন্নত চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে খাদীজা তার বান্ধবী নাফিসা মারফত তাঁর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। নবী স. তাঁর চাচা আবু তালিবের পরামর্শক্রমে ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়স্কা খাদীজাকে বিবাহ করেন। বৃদ্ধা খাদীজাকে রা. নিয়ে তিনি দীর্ঘ ২৫ বছরের দাম্পত্য জীবন

অতিবাহিত করেন। সেকালে আরবদের মধ্যে বহুসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের একটি সাধারণ রেওয়াজ থাকলেও খাদীজার রা. জীবদ্দশায় তিনি দ্বিতীয় কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি।

দীর্ঘ এই দাম্পত্য জীবনে তিনি খাদীজাকে নিয়ে অত্যন্ত সুখী ছিলেন। খাদীজা রা.-কে তিনি এত গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন যে, পরবর্তীকালে অন্য কোন স্ত্রীকে এতটা ভালবাসেননি। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, 'খাদীজার রা. প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হত ততটা ঈর্ষা নবীর স. অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না। অথচ আমি তাকে দেখিনি। নবী স. অধিকাংশ সময় তার আলোচনা করতেন এবং যখনই তিনি বকরী যবেহ করতেন তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে তা যথেষ্ট পরিমাণে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য হাদীয়া হিসাবে পাঠাতেন। আমি নবী স.-কে মাঝে মাঝে রসিকতার ছলে বলতাম, মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকই নেই। তখন তিনি বলতেন– হ্যাঁ, সে এরকমই ছিল। আর তার থেকেই আমার সন্তান-সন্ততি।'[৯] খাদীজার রা. প্রতি নবীর স. ভালোবাসা সম্পর্কে মার্মাডিউক পিকথল তার The Glorious Quran গ্রন্থে বলেন, 'Throughout the twenty six years of their life together he remained devoted to her, and after her death, when he took other wives he always mentioned her with the greatest love and reverence.[10] '২৬ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি (নবী স.) তার (খাদীজা রা.) প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন এবং তার মৃত্যুর পর যখন তিনি অন্যান্য স্ত্রী গ্রহণ করেন তখনও সবসময় গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সহকারে তার উল্লেখ করতেন।'

একজন নারীলিপ্সু লোকের পক্ষে এরূপ একজন বৃদ্ধা মহিলার প্রতি এত গভীর ভালোবাসা থাকা অসম্ভব।

এরপরও যারা মহানবী স.-কে নারীলিপ্সু বলেন তাদের নিকট জিজ্ঞাসা–যিনি তাঁর পূর্ণ যৌবন (২৫-৫০ বয়স পর্যন্ত) একজন বৃদ্ধা স্ত্রীকে নিয়ে অতিবাহিত করলেন, তখন তাঁর দ্বিতীয় কোন স্ত্রীর প্রয়োজন হল না, অথচ তিনি ৫০ পরবর্তী বৃদ্ধ বয়সে এসে নারী লিপ্সু হলেন-একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? এটা স্পষ্ট যে, স্বাভাবিকভাবে ৫০ বছরে উপনীত একজন মানুষ যৌবন শেষ করে বার্ধক্যে উপনীত হয়। যে বয়সে একজন নারীলিপ্সু লোকও সংযত হয়, সে বয়সে একজন নবীর বিরুদ্ধে নারীলিপ্সুতার অভিযোগ কতটুকু সত্য? যদি তিনি নারী লিপ্সুই হতেন তবে তাঁর পক্ষে পূর্ণ যৌবনকাল একজন বৃদ্ধা স্ত্রী নিয়ে অতিবাহিত করা কোন ভাবেই সম্ভব হতো না। বরং এর মধ্যে তিনি অনেকগুলো বিবাহ করতেন নতুবা অনেক মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। খাদীজার জীবদ্দশায় তিনি কোন মহিলার প্রতি কখনও আকৃষ্ট হয়েছিলেন অথবা দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন– এমন কোন কথা তাঁর শত্রুরাও বলতে পারেনি। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হামমুদাহ আবদালাতি বলেন, 'সেই দেশে এত অসাধারণ বয়সে পৌঁছে তিনি (মুহাম্মদ স.) সর্বপ্রথম বিবাহ করেন দু'দুবারের বিধবা এবং তার চেয়ে ১৫ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ খাদীজা নাম্নী এক প্রবীণ মহিলাকে। এ বিবাহে খাদীজা ছিলেন উদ্যোক্তা এবং তার অধিকতর বয়স সত্ত্বেও

মহানবী স. তার প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। তিনি যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণ হতেন, কিংবা দৈহিক পরিতৃপ্তি খুঁজতেন তবে সে সময়ে অনেক পরমা সুন্দরী, যুবতী ও অল্পবয়স্কা কুমারী স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতেন।'[১১]

উল্লেখ্য, সে যুগে কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর দেয়া হতো এবং পুত্র সন্তান চরম কাম্য ছিল। কিন্তু হযরত খাদীজা রা.-এর গর্ভে মহানবী স.-এর চার কন্যা ও দুই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্র সন্তান দু'জনই অল্প বয়সে মারা যায়। তাই পুত্র সন্তানের জন্য তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ করার অধিকার ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন বোধ করেননি। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, During the life time of Khadija, the Prophet married no other wife, not with standing that public opinion among his people would have allowed him to do so had he chosen.[12] 'খাদীজার জীবদ্দশায় নবী কোন বিবাহ করেননি, যদি তিনি বিবাহ করা পছন্দ করতেন জনমত তা অনুমোদন করত।'

এমন কি মহানবী স. বিবাহ পূর্ব তো নয়ই এবং বিবাহ পরবর্তীকালেও কোন মহিলার দিকে চোখ তুলে তাকাননি। এমতাবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে এসে তাঁর বিবাহগুলোর কারণে তাঁকে নারীলিপ্সু বলা অযৌক্তিক। এ প্রসঙ্গে J. Davenport-এর উক্তি উল্লেখযোগ্য- It shuold be remembered that, He lived from the age of twenty-five to that of fifty years satisfied with one wife that until she died at the age of sixty-five he took no other.[13] And it may than be asked, is it likely that a very sensual man of a country where ploygamy was a practice, should be contented for twenty-five years with one wife, She being fifteen years older than himself. 'তিনি ২৫ বছর থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত একজন স্ত্রীতে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং এই স্ত্রীর ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি। এখন এটাই জিজ্ঞাস্য; বহু বিবাহ যে দেশের প্রচলিত প্রথা, সে দেশে একজন অতীব ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি নিজ অপেক্ষা ১৫ বছর অধিক বয়স্কা একমাত্র স্ত্রীতে ৫০ বছর পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকবেন তা কিরূপে সম্ভব?'

কোন কোন সমালোচক বলেন, মহানবী স. খাদীজা রা.-কে সম্পদের লোভে বিবাহ করেন। প্রকৃতপক্ষে এটাও জঘন্য মিথ্যাচার। সম্পদের লোভে বিবাহ করলে তিনি খাদীজার সমুদয় সম্পত্তি ইসলামের কাজে ব্যয় না করে নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য ব্যয় করতেন, কিন্তু তিনি কখনই তা করেননি। বরং তিনি অত্যন্ত কষ্টে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এক নাগাড়ে দুই বেলা যবের রুটি পেট ভরে খেতে পাননি।'[১৪] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন একাধারে কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। তাদের জন্য রাতের খাবার জুটত না। আর অধিকাংশ সময় যবের রুটিই ছিল তাদের খাদ্য।'[১৫] রসূল স.-এর অনাড়ম্বর জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরে এডওয়ার্ড গীবন বলেন,

The good sense of Mohammad despised the pomp of royaltys, The apostle of God submitted to menial offices of the family; He kindled the fire, swept floor, Milked the ewes, and mended with his own hands his shoes and his woollen garments Disdaining the penance and merit of a hermit, He observed, without effort or vanity, the abstemious diet of an Arab and a soldier.[১৬] 'মুহাম্মদ যাবতীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেও রাজকীয় জাঁকজমককে তুচ্ছ মনে করেছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত মহাপুরুষ হয়েও নিজ গৃহে ভৃত্যের কাজ করতে দ্বিধা বোধ করেননি। নিজে আগুন জ্বালাতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, ভেড়ীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজ হাতে জুতা ও পশমী জামা মেরামত ও সেলাই করতেন। তিনি বৈরাগ্যের কঠোরতা ও সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্রতা পরিহার করে আরব সৈনিকোচিত মিতাহার গ্রহণ করতেন।'

রসূল স.-এর সরল জীবনের চিত্র সম্পর্কে P.K. Hitti বলেন, Even in the hight of his glory Muhammad Led, as in his days of obsurrity, an unpetetous life in one of those clay houses........ He was often seen mending his own colthes and was at all times within the reach of his people.[17] 'তাঁর জীবনের অখ্যাত অধ্যায়ের মত গৌরবময় অধ্যায়ও তিনি একটি মাটির বাড়ীতে অতি সাদাসিধাভাবে জীবন যাপন করতেন।....... প্রায়ই তাঁকে নিজের কাপড় সেলাই করতে দেখা যেতো এবং সর্বদাই সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর দ্বার অবারিত ছিল।'

২. হযরত সাওদা রা.

হযরত খাদীজা রা.-এর মৃত্যুর পর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মহানবী স.-কে অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে অবস্থান করতে হত। তাঁর সংসার ও অল্পবয়স্ক সন্তান উম্মে কুলসুম ও ফাতিমাকে রা. দেখাশুনার জন্য কেউ ছিল না। এমতাবস্থায় খাওলা বিনতে হাকিম রা. নবী স.-এর নিকট তাঁর সংসার ও সন্তানদের দেখাশুনা করার জন্য বিধবা হযরত সাওদা রা.-কে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন নবী স. খাওলার প্রস্তাব গ্রহণপূর্বক ৫২ বছর বয়সে ৫০ ঊর্ধ হযরত সাওদাকে বিবাহ করেন।

হযরত সাওদা নবুয়তের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী মহিলা, যিনি পূর্বে হযরত সুকরান ইবনে আমরের রা. স্ত্রী ছিলেন। তার স্বামীর সঙ্গে তিনি আবসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে কয়েক বছর থাকার পর মক্কায় ফিরে আসলে কিছুদিন পর তার স্বামী ইন্তেকাল করেন। বিধবা সাওদা সন্তান নিয়ে খুব কষ্টের মধ্যে পড়েন। আর ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি পরিবার থেকে বঞ্চিত এবং বিতাড়িত ছিলেন। ফলে তার কোন আশ্রয়স্থল ছিল না। অধিকন্তু, এত অধিক বয়স্কা বৃদ্ধা মহিলাকে সন্তানসহ কেউ বিবাহ করতে রাজি ছিল না। এরূপ এক করুণ পরিস্থিতিতে মহানবী স. তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, Every principle of

generosity and humanity would impel Mohammed to offer her his hand. Her husband had given his life in the cause of the new religion; he had left home and country for the sake of his faith, his wife had shared his exile and now had returned to Mecca destitute. As the only means of assisting the poor woman, Mohammed though straitened for the very means of daily subsistence, married Sauda.[18]

'উদারতা ও মানবিকতার প্রত্যেকটি মূলনীতি মুহাম্মদকে এ ব্যাপারে তাঁর হস্ত প্রসারিত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। নতুন ধর্মের জন্য তার স্বামী জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ধর্মের জন্য তিনি গৃহ ও দেশ ত্যাগ করেছিলেন। তার স্ত্রী নির্বাসনে সাথী ছিলেন এবং নিঃসম্বল অবস্থায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। দীনহীনা স্ত্রীলোকের একমাত্র সাহায্য করার উপায় বিবাহ হওয়া, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের সম্বল অত্যন্ত সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ সাওদাকে বিবাহ করেন।'

উল্লেখ্য যে, মহানবী স.-এর সাথে বিবাহের সময় সাওদা ছিলেন ৫০ উর্ধ বৃদ্ধা, সমালোচকদের অভিযোগ অনুযায়ী তিনি যুবতী, সুন্দরী, সম্পদশালী অথবা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না, যে কারণে কেউ তাকে বিবাহে ইচ্ছুক ছিল। যদি তিনি কামুক হতেন, তবে নিশ্চয়ই যুবতী আকর্ষণীয়া কোন রমণীকে বিবাহ করতেন যা বয়স্কা সাওদার মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। S M Madani Abbasi *বলেন,* The Holy Prophet (SAW) was still in perfect health and manly power, and could have easily gone for a younger wife, was this act of self denial or the act of a licentious man, marrying a miserable and poor elderly widow with a son from her former husband?[১৯] 'নবী স. তখনও পূর্ণ স্বাস্থ্যবান ও পৌরুষ শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি সহজেই একজন যুবতী স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতেন। অথচ তিনি তা না করে পৌঢ় ও পূর্ব স্বামীর সন্তানসহ একজন দুঃখী বিধবাকে বিবাহ করেন। এটা কি একজন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগীর কাজ, নাকি কামুকের কাজ?'

হযরত সাওদা রা. একবার মহানবী স. থেকে তালাকের আশংকা করেন, সে সময়ে তিনি হযরত আয়েশা রা.-এর অনুকূলে তার ভাগ ছেড়ে দেন এবং নবী স.-এর স্ত্রী হিসেবে মৃত্যুবরণের একান্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, যাতে পরকালে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হন। নবী স. তাকে তালাক দেননি।

৩. হযরত আয়েশা রা.

হযরত আয়েশা রা. মহানবী স.-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবু বকর রা.-এর কন্যা। ৫২/৫৪ বছর বয়সে মহানবী স. তাকে বিবাহ করেন। তিনিই ছিলেন নবী স.-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। পাশ্চাত্যের সমালোচকগণ মহানবী স.-এর এই বিবাহ নিয়ে অনেক সমালোচনা করেছেন। আয়েশা রা.-কে বিবাহের প্রকৃত কারণ সহ নিম্নে সমালোচকদের সমালোচনার জবাব ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হল :

আয়েশা রা. কে বিবাহের কারণ

রসূল স. আয়েশা রা.-কে নিজ খেয়াল খুশি মত বিবাহ করেননি। মূলত দুটি কারণে তিনি আয়েশা রা.-কে বিবাহ করেন।

এক. স্বয়ং মহান আল্লাহ আয়েশা রা.-কে বিবাহের জন্য মহানবী স.-কে পরোক্ষ নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রা. বলেন, 'রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি তোমাকে দু'বার স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমি দেখি তোমাকে একজন লোক রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে এসেছে, এরপর আমাকে বলছে– ইনি আপনার স্ত্রী, খুলে দেখুন, আমি খুলে অবাক হয়ে তোমাকে দেখতে পাই। আমি বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তাহলে অবশ্যই পূর্ণ হবে।'[২০]

উল্লেখ্য যে, নবী-রসূলদের স্বপ্ন ওহি, যা পালন করা তাদের জন্য আবশ্যক। এক্ষেত্রে হযরত ইব্রাহীম আ. কর্তৃক ইসমাইল আ.-কে কুরবানীর ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া মুহাম্মদ স. এবং আয়েশা রা. যদি সাধারণ পুরুষ ও সাধারণ নারী হতেন তবে তাদের বিবাহের ব্যাপারে অভিযোগ করা যেত। মুহাম্মদ স. রসূল ছিলেন। ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে সমাজের সার্বিক বিপ্লব সাধন তাঁর দায়িত্ব ছিল। হযরত আয়েশা রা. ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন একজন মহিলা যাকে বিরাট মানবিক যোগ্যতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনে রসূল স.-এর সাথে মিলে এত বিরাট কাজ করতে হয়েছিল যা সকল নবী পত্নীসহ কোন মহিলা করেননি। এ কারণে স্বয়ং আল্লাহ আয়েশাকে তাঁর রসূলের স্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন। অল্প বয়স্কা এই মেয়েটি রসূল স.-এর সংস্পর্শে আসলে ইসলামী সমাজ বিরাট উপকৃত হবে, এটা আল্লাহর জানা ছিল। তাই স্বয়ং আল্লাহ এই বিবাহ নির্ধারিত করেন। কাজেই এই বিবাহের কারণে রসূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অর্থ আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপরীত অভিযোগ করা।

দুই. হযরত আবু বকর রা. রসূল স.-এর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য আত্মীয়তা করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, Abu Bakar, as by anticipation we may well call him, had a little daughter named Ayesha, and it was the desire of his life to cement the attachment, which existed between himself and the Prophet, who had led him out from the darkness of skepticism, by giving Mohammed his daughter in marriage.....At the earnest solicitation of the disciple the little maiden become he wife of the Prophet.[21]

'আবু বকরের (যাকে আমরা এ নামে যথাযথভাবে অভিহিত করতে পারি) আয়েশা নামের অল্প বয়স্কা একটি কন্যা ছিল। তার জীবনে একমাত্র অভিপ্রায় ছিল যিনি তাঁকে অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে মুক্ত করেছেন সেই হযরত ও তাঁর মধ্যে যে ভালবাসার সম্পর্ক বিরাজ করছে তা চিরস্থায়ী বন্ধনে বেধে দেবেন তাঁর (মুহাম্মদ) সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে।.... ভক্তের ঐকান্তিক অনুরোধের ফলে নাবালিকা কুমারী হযরতের স্ত্রীতে পরিণত হয়।'

তাই দেখা যায় খাওলা বিনতে হাকিম রা. যখন রসূল স.-এর সাথে আয়েশা রা.-এর বিবাহের ব্যাপারে হযরত আবু বকর রা.-এর নিকট প্রস্তাব দেন...... তখন আবু বকর রা. ও তাঁর স্ত্রী উম্মে রুমান খুব খুশি হয়ে সম্মতি দেন।

এ বিবাহের কারণে যারা মহানবী স.-কে প্রবৃত্তি পূজারী ও কামলিপ্সু বলেন, তাদের নিকট প্রশ্ন, যিনি ২৫ বছর থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত একজন বৃদ্ধা স্ত্রীতে তুষ্ট যে তার চেয়ে ১৫ বছরের বড় এবং প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর যিনি ৫০ উর্ধ বৃদ্ধা স্ত্রীকে (সাওদা) নিয়ে ৪/৫ বছর পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁকে কামলিপ্সু বলা কি উদ্দেশ্যমূলক নয়? অথচ তিনি প্রবৃত্তি লালসা চরিতার্থ করার জন্য বিবাহ করতে চাইলে তার চেয়ে সুন্দরী কুমারী মেয়েকে বিবাহ করতে পারতেন।

হযরত আয়েশা রা.-এর প্রতি জুলুমের অভিযোগের জবাব

৫২/৫৪ বছর বয়সে মহানবী স. সাত বছরের ছোট মেয়ে হযরত আয়েশা রা.-কে বিবাহ করেন। তাকে নবী স. ১৮ বছর বয়সে বিধবা রেখে মারা যান, যখন তার অন্যত্র বিবাহ সম্ভব ছিল না। ফলে তার সমগ্র যৌবনকাল বিধবা অবস্থায় কাটাতে হয়। যারা এ অভিযোগ করেন তারা বুঝতে চান না যে, 'মহান কাজের কল্যাণকারিতা মানব জাতির নিকট সীমিত কালের জন্য নয়, বরং সর্বকালের জন্য এবং কোন অঞ্চলের মানুষের জন্য নয় বরং গোটা বিশ্বের (মানব জাতির) জন্যে। এ ধরনের কাজে লক্ষ লক্ষ মানুষের জান-মাল ব্যয় হওয়া কোন লোকসানের বিষয় নয়। অথচ সে কাজে একজন মহিলার যৌবন ব্যয়িত হওয়াকে কোরবানীর পরিবর্তে জুলুম নামে অভিহিত করা হচ্ছে।'[২২] অথচ তার এই কোরবানীর মাধ্যমে তিনি পারিবারিক ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে গোটা জীবন এক বিরাট সংখ্যক নারী-পুরুষকে ইসলামের শিক্ষাদানের কাজে অতিবাহিত করেন। যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ সে মহান শিক্ষা থেকে যুগে যুগে উপকৃত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার শিক্ষা থেকে মানুষ উপকৃত হবে।

হযরত আয়েশা রা. অতুলনীয় গুণবতী ও তীক্ষ্ণ মেধাবী ছিলেন। রসূল স.-এর সাহচর্যে ও প্রশিক্ষণে তিনি তার অসাধারণ মেধার মাধ্যমে ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহের গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। হাদীস ও ফিক্‌হ যিনি অধ্যয়ন করেছেন তিনি জানেন মহানবী স.-এর যুগের নারী তো দূরের কথা অল্প ক'জন পুরুষ সাহাবী ছাড়া ইলমে দীনের খেদমতে কেউ তার সমকক্ষ ছিল না। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ছিল ২২১০টি। তিনি শুধু হাদীসবেত্তা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সির, মুজতাহিদ ও মুফতি। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনি ইসলামে সর্বাধিক অবদান রাখেন। প্রথম শ্রেণীর সাহাবীগণও তার থেকে মাসআলা জেনে নিতেন। সাহাবী-রা কোন কঠিন প্রশ্নের সমাধান দিতে না পারলে তার নিকট যেতেন। তিনি তার সমাধান দিতেন। তিনি ইলমে হাদীস ও ফিক্‌হ এর যে খেদমত করছেন তা বিরল। এ সম্পর্কে S.M Madani Abbasi বলেন, Hazrat Ayesha occupies a very important place in the domain of Islamic culture and traditions. She is the main source of large number

of traditions (Ahadis) and their authenticity. It is only she through whom we get solutions and answers of thousands of problems, realating to females, which a male person could not solve or explain. Her version of tradition is accepted by all the compilers of traditions. In fact she had played magnificent and glorious role in the develolpment and progress of Islam and its principles.[23]

'হযরত আয়েশা রা. হাদীস ও ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। তিনি ব্যাপক সংখ্যক হাদীসের বর্ণনাকারী ও এর নির্ভরযোগ্য উৎস। শুধুমাত্র তার থেকে আমরা মহিলা সংক্রান্ত হাজার সমস্যার সমাধান পাই, যেগুলো পুরুষের পক্ষে ব্যাখ্যা বা সমাধান সম্ভব নয়। তার বর্ণিত হাদীস সর্বজন কর্তৃক শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এবং এর মূলনীতির উন্নতির ক্ষেত্রে তিনি চমকপ্রদ ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখেন।'

কোন কোন আলেম মনে করেন, ইসলামী শরীয়তের এক চতুর্থাংশ নির্দেশাবলী তার থেকে বর্ণিত। তিনি ১৮ বছর বয়সে বিধবা হয়ে ৪৮ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি ইলমে দীনের খেদমত করে যান। যদি রসূল স.-এর সাথে তার বিবাহ না হতো তবে তিনি রসূল স. থেকে এই শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পেতেন না। ফলে হয়তো ইসলামী জ্ঞানের বিরাট অংশ থেকে মুসলমানগণ বঞ্চিত হতেন। রসূল স.-এর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের স্বরূপ উপস্থাপনে এবং ইসলামের বহুবিধ বিধি-বিধান বিশেষ করে নারী সংক্রান্ত বিধি-বিধান বিষয়ে তার অবদান অনন্য। আবু মূসা আল-আশয়ারী রা. বলেন, আমরা রসূল স.-এর সাহাবীদের কাছে কোন হাদীসের অর্থ বুঝতে কষ্ট হলে আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞাসা করে তার নিকট এর সঠিক জ্ঞান লাভ করেছি।[২৪]

হিশাম ইবনে উরওয়া বলেন, আমি কুরআন, ফারায়েজ, হালাল, হারাম ফিকহ (বিধি-বিধান), কাব্য, চিকিৎসা, আরবের ইতিহাস ও আবরদের নসবনামা (বংশ পরিচয়) সম্পর্কে আয়েশার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ কাউকে দেখিনি।'[২৫] ইমাম যুহরী বলেন, 'যদি সকল মানুষ ও রসূলুল্লাহর বেগমদের ইলম (জ্ঞান) একত্র করা যেত তাহলে তাদের মধ্যে আয়েশার ইলম অধিকতর প্রশস্ত ও বিস্তৃত হত।'[২৬] তিনি আরও বলেন, 'হযরত আয়েশা রা. তৎকালীন আরবের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। রসূলুল্লাহ স.-এর অনেক বড় বড় সাহাবী তার কাছে জ্ঞান অর্জন করেন।'[২৭] বিভিন্ন মাসলা-মাছায়েলের ক্ষেত্রে সাহাবীরা তার শরণাপন্ন হতেন। কাবীসা বিনতে জওয়ারা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রা. মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ তার নিকট মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতেন।[২৮]

অল্প বয়সে স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার অভিযোগের উত্তর

মহানবী স.-এর সাথে বিবাহ ও মিলনের সময় আয়েশা রা.-এর প্রকৃত বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। ইমাম বুখারীর মতে, 'আয়েশার রা. আকদ তাঁর ছয়

বছর বয়সে এবং রুসমাত নয় বছর বয়সে সমাধা হয়েছিল।' ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, 'হযরত আয়েশার রা. আকদ সাত বছর বয়সে রুসমাত নয় বছর বয়সে হয়েছিল।' ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাক্বাত' গ্রন্থের একটি বর্ণনায় বলেন, হযরত আয়েশার রা.-এর বিবাহের সময় বয়স ছিল ৯ বছর। তবে এখানে রুসমাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। একদল আলেম মনে করেন, আয়েশার রা. বিবাহ হয় ৯/১০ বছর বয়সে এবং রুসমাত হয় ১৪/১৫ বছর বয়সে। এ মত সমর্থন করে মওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, The popular account that she was six years at marriage and nine years at the time of consummation is decidedly no correct.[29]

'ছয় বছর বয়সে তার বিবাহ এবং নয় বছর বয়সে রুসমাত সম্পর্কিত বহুল প্রচারিত মতটি যথার্থ নয়।' এই মতের সমর্থনে দলিল হল– হযরত আয়েশা রা. ছিলেন রসূল স.-এর মেয়ে ফাতিমার রা. চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। ফাতেমা রা.-এর জন্ম হয় নবুয়তের পাঁচ বছর পূর্বে কাবা পুননির্মাণের বছর। সে হিসাবে আয়েশার জন্ম নবুয়তের ১ম বর্ষে। কাজেই নবুয়তের ১০ম বর্ষে বিবাহের সময় তার বয়স ছিল কমপক্ষে ৯/১০ বছর। আর দ্বিতীয় হিজরীতে তার রুসমত হয়। এ সময় তার বয়স ছিল কমপক্ষে ১৪/১৫ বছর। তাই রসূল স.-এর সাথে মিলনের সময় আয়েশার বয়স ৯ বছর ছিল না বরং তার বয়স কমপক্ষে ১৪ বছর ছিল এটাই সুস্পষ্ট। এরূপ বয়সে স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার বিষয়টি যারা সমালোচনা করেন তারা জানে না যে, ইসলাম প্রাকৃতিক ধর্ম। একজন মেয়ে যদি দৈহিক গঠনে ও বর্ধনে এ বয়সে সাবালিকা ও উপযুক্ত হন তবে তার স্বামীর সাথে মিলিত হওয়া দূষণীয় নয়, বরং তা বৈধ। হযরত আয়েশা রা. শারীরিক গঠনে ও বর্ধনে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর ঘর করার উপযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানেও এরূপ অনেক অল্প বয়স্কা মেয়েকে শারীরিক গঠনে উপযুক্ত হতে দেখা যায়। কাজেই উক্ত বয়সে আয়েশা রা.-এর জন্য স্বামীর ঘর করা জুলুমের বিষয় ছিল না।

পাশ্চাত্যের অনেকেই রসূল স.-এর এই বিবাহের বিষয়টি সমালোচনা করেছেন। অথচ পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশে ৮-১০ বছরের অনেক বালিকাকে যৌন কাজে ব্যবহার করা হয়। এটা কি জুলুম নয়? তাদের সমাজে ১৮ বছরের পূর্বে বিবাহ বৈধ নয়, কিন্তু অবাধ ব্যভিচার বৈধ। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তারা বৈধ বিবাহের অনুমোদন করে না। কিন্তু তারা বিবাহ পূর্ব ব্যভিচার যতই হোক না কেন তা অবৈধ মনে করে না। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজের একটি জরিপ চিত্র হচ্ছে– Among the males going to collage about 67 percent have such experience before marriage among those who go to a high school about 85 percent have such intercourses and among the boys who do not go beyond he grade school the accumulative evidence is 98 percent.[30]

'কলেজগামী পুরুষদের শতকরা ৬৭ ভাগ বিবাহের পূর্বে যৌন সম্ভোগ করে থাকে। হাই স্কুলগামীদের মধ্যে শতকরা ৮৪ জন এরূপ সম্ভোগ লাভ করে এবং যে সব বালক গ্রেড স্কুল ছাড়িয়ে

যায় না তাদের সংখ্যা শতকরা ৯৮ জন।' তাদের চরিত্র ও নৈতিকতার অবস্থা এরূপ হওয়ার পরও কিভাবে তারা আল্লাহর রসূলের সমালোচনা করেন?' এছাড়া স্কুল পড়ুয়া বালিকাদের বিবাহ পূর্ব মাতা হওয়াটা তো এখন পাশ্চাত্যের প্রকট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে এদের স্বেচ্ছায় যৌনকর্মকে তারা কি বলবেন?

৪. হযরত হাফসা রা.

হযরত হাফসা রা. ছিলেন রসূল স.-এর প্রিয় সহচর হযরত ওমর রা.-এর কন্যা। রসূলের স. সাথে বিবাহের পূর্বে তার বিবাহ হয় হযরত খুনাইস ইবনে হুযাইফার রা. সাথে। হযরত খুনাইস রা. বদর যুদ্ধে আহত হয়ে শাহাদত বরণ করলে তিনি বিধবা হন। পিতা হযরত ওমর রা. তাকে পুনর্বিবাহ দিতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। কারণ তিনি তার পিতার মত রাগী স্বভাবের ছিলেন। ফলে কেউ তাকে বিবাহ করতে রাজি হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত ওমর রা. উদ্বিগ্ন হয়ে নিজে তার ব্যাপারে হযরত আবু বকর রা.-এর নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু হযরত আবু বকর রা. এ ব্যাপারে নিরুত্তর থাকেন। এরপর হযরত ওসমান রা.-এর নিকট হযরত ওমর রা. একই প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনিও ওমর রা.-এর সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। আবুবকর রা. ও ওসমান রা.-এর এই আচরণে তিনি কষ্ট পেয়ে রসূল স.-এর নিকট বিষয়টি পেশ করেন। রসূল স. হাফসার অবস্থা অনুধাবন করে ৫৬ বছর বয়সে ১৯/২০ বছর বয়স্কা হাফসাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

এই বিবাহের মাধ্যমে রসূল স. যেমন ওমর রা.-এর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় ও তার মনতুষ্টি করেন, তেমনি তাঁর এক শহীদ সাহাবীর বিধবা স্ত্রীর বৈধব্য মোচন করেন। এ সম্পর্কে হাইকল বলেন, 'Aishah and Hafsah were daughters of his two viziers Abu Bakar and Umer respectively. It was this relation of their father's to Muhammad which caused the later to cement his relationship with them by blood, that is why he married their two daughters, that is why he gave in marriage his two daughters to Uthman and Ali.'[31]

'আয়েশা ও হাফসা ছিলেন তাঁর দুই সহচর আবুবকর ও ওমরের কন্যা। তাদের সাথে মুহাম্মদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই তাদের মাঝে রক্তের সম্পর্ক স্থাপনের কারণ। আর একই কারণে তিনি তাঁর কন্যাদ্বয়কে উসমান এবং আলীর রা. সাথে বিবাহ দেন।'

উল্লেখ্য, এক সময় রসূল স. হযরত হাফসার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং এক তালাক প্রদান করেন। এ সংবাদ শুনে হযরত ওমর রা. খুব বিচলিত ও চিন্তিত হন। কিন্তু পরবর্তীতে রসূল স. ওমর রা.-এর সাথে সম্পর্কের বিবেচনা করে তাকে ফিরিয়ে নেন। এ সম্পর্কে আব্দুর রউফ দানাপুরী বলেন, 'হযরত হাফসা রা. কিছুটা উগ্র প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। হুজুর স. তাকে একবার এক তালাকও দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত উমর রা.-এর মনকষ্টের কথা বিবেচনা করে পরে তাকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।'[৩২] মুখতাছার ফিস সীরাহ গ্রন্থে আবু মুহাম্মদ

আল মুকাদ্দাসী বলেন, হযরত হাফসা রা.কে রসূল স. এক তালাক দিলে জিব্রাইল আ. তাঁকে জানান হাফসাকে পুনরায় গ্রহণ করতে আল্লাহ আপনাকে আদেশ দিয়েছেন।'

৫. হযরত যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা.

যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা. উম্মুল মাসাকীন (অসহায়-নিঃস্বদের মাতা) হিসেবে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী মুসলিম ছিলেন। রসূল স.-এর সাথে বিবাহের পূর্বে তার দুই জায়গায় বিবাহ হয়। তিনি প্রথম স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হন। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের রা. সাথে তার বিবাহ হয়। আব্দুল্লাহ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলে তিনি খুব অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তার পিতা-মাতা উভয়ই অমুসলিম থাকায় তার কোন আশ্রয় ছিল না। এমতাবস্থায় এই মহৎ মহিলাকে আশ্রয় দেয়ার উদ্দেশ্যে ৫৭ বছর বয়সে মহানবী স. ৩০ বছর বয়স্কা যায়নাবকে বিবাহ করেন। বিবাহের দুই-তিন মাস পর যায়নাব রা. ইন্তেকাল করেন। এ বিবাহ সম্পর্কে আব্দুল হামীদ সিদ্দীকি তার The Life of Muhamad গ্রন্থে বলেন, It was on this ground of clemency and compassion that the Holy Porphet married Zaynab, the daughter of Khuzaimah, who had been deprived of her husband in Uhud. Her parents were non Muslims living in Mecca and after the martyrdom of her husband there was non to take care of her.[33]

'দয়া ও উদারতার কারণে নবী স. যায়নাব বিনতে খুযাইমাকে বিবাহ করেন, যার স্বামী উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তার অমুসলিম পিতামাতা মক্কায় বাস করছিলেন এবং তার স্বামীর শাহাদতের পর তাকে দেখাশুনার ও আশ্রয় দেয়ার কেউ ছিল না।'

৬. হযরত উম্মে সালামা রা.

হযরত উম্মে সালামা মক্কার কুরাইশ গোত্রের শাখা বনু মাখযুমের একটি প্রভাবশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার স্বামী আবু সালামার রা. সাথে তিনি ইসলামের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুয়তের ৬ষ্ঠ বর্ষে তিনি স্বামীর সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে তারা মক্কায় ফিরে আসেন। কিছুদিন পর তিনি স্বামীর সাথে মদীনায় হিজরতের জন্য বের হন। কিন্তু তার পরিবার তাকে গৃহবন্দী করে রেখে ইসলাম থেকে ফিরাবার জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে।

দীর্ঘ নির্যাতন ভোগের পর তিনি ছাড়া পেলে একাকী মদীনার উদ্দেশ্যে বের হন এবং অতি কষ্টে মদীনায় পৌছে স্বামীর সাথে মিলিত হন। অল্পকাল পরে তার স্বামী উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মারাত্মক আহত হয়ে শাহাদত বরণ করেন। তার স্বামীর শাহাদতের পর তিনি ৪/৫ জন সন্তান নিয়ে সংকট ও কষ্টকর অবস্থায় পড়েন, মক্কায় তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়রা অমুসলিম এবং কঠোর ইসলাম বিদ্বেষী থাকায় তাদের নিকট ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এদিকে মদীনায় তার কোন আশ্রয়স্থল ছিল না। এমতাবস্থায় এই অসহায় মহিলা ও তার ৪/৫ জন সন্তানকে আশ্রয় দেয়ার

উদ্দেশ্যে মহানবী স. নিজ উদ্যোগে ৫৭ বছর বয়সে ৩০ বছর বয়স্কা বিধবা উম্মে সালামা রা.-কে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে ইসলাম বিদ্বেষী বানু মাখযুম গোত্রের লোকেরা অনেকটা প্রভাবিত হয়। মহানবী স. ও ইসলামের প্রতি তাদের শত্রুতা অনেকটা কমে যায়। এ সম্পর্কে W.M. Watt বলেন, This marriage was at the very least a way of providing for an important Emmigrant widow but it may also have been designed to help Muhammad to reconcile the Meccans.[34]

'এ বিবাহের মাধ্যমে অন্ততপক্ষে একজন গুরুত্বপূর্ণ হিজরতকারী বিধবা মহিলার পুনর্বাসন হয়েছিল। কিন্তু তাছাড়াও মুহাম্মদের এ বিবাহ মক্কাবাসীর বিরোধ দূর করে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে সহায়তা করে থাকতে পারে।'

খৃস্টান ধর্মযাজক ও প্রাচ্যবিদরা অপপ্রচার করেছেন যে, মুহাম্মদ স. উম্মে সালামার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করেন। নারী সৌন্দর্যই যদি তাঁর বিবাহের উদ্দেশ্য হতো তবে আনসার[৩৫] ও মুহাজিরীনদের[৩৬] মধ্যে অনেক সুন্দরী যুবতী, সম্পদশালী মেয়েদের বিবাহ করতে পারতেন। যারা প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে তার চেয়ে অনেক উর্ধে ছিল। যাদের সাথে উম্মে সালামা রা.-এর কোন তুলনাই হয় না। কারণ তিনি প্রথমত ছিলেন বয়স্কা বিধবা তদুপরি তার প্রথম স্বামীর ৪/৫ জন সন্তান ছিল।

৭. হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা.

হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. ছিলেন মহানবী স.-এর ফুফু উমাইয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা। মহানবী স.-এর সাথে বিবাহের পূর্বে তার বিবাহ হয় যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে, যিনি নবী স.-এর মুক্তদাস ও পালকপুত্র ছিলেন। ৩৫/৩৮ বছর বয়সে তিনি যায়েদ কর্তৃক তালাক প্রাপ্ত হলে নবী স. ৫৮ বছর বয়সে তাকে বিবাহ করেন। মহানবী স.-এর এ বিবাহ নিয়ে প্রাচ্যবিদ ও খৃস্টান ধর্মযাজকরা সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে তারা একটি মিথ্যা কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করে নবী স.-এর নামে অপবাদ রটিয়েছে। কল্পিত কাহিনীটি হল 'একদিন তিনি (নবী) যায়েদের খোঁজে তার ঘরে যান। যায়েদ তখন ঘরে ছিল না। যায়নাব নবীকে স. অভ্যর্থনা জানায় এবং ঘরে বসার অনুরোধ জানান। আর এ সময় যায়নাব পোশাক পরায় ব্যস্ত ছিলেন। যায়নাবকে দেখে নবী স. এই কথা বলে ফিরে আসেন যে, 'আল্লাহ পবিত্র, যিনি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন করেন।' এতে যায়নাবের মনে উচ্চাভিলাষ জন্মে। যায়েদ ঘরে ফিরে এলে জায়নাব তার ব্যাপারে নবী স.-এর প্রশংসাকৃত বাক্য যায়েদের নিকট গর্ব সহকারে বর্ণনা করে।' সমালোচকদের মতে- এ ঘটনার পর যায়েদ ও যায়নাবের সম্পর্কে অবনতি ঘটে এবং একপর্যায়ে বিচ্ছেদ ঘটে। এই সূত্র ধরে তারা বলে থাকেন, যায়নাবের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পালক পুত্র যায়েদ থেকে তার স্ত্রী যায়নাবকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুহাম্মদ স. নিজে বিবাহ করেছেন।

এই কাহিনীটি কল্পিত এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ প্রসঙ্গে Bosworth Smith বলেন, 'It should be rememebered, however, that most of Mohammed's marriages may be

explained at least as much by his pity for the for-lorn condition of the persons concerned, as by other motives. They were almost all of them widows who are not remarkable either for their beauty or their wealth, but quite the reverse. May not this fact, and his undoubted faithfullness to Khadija till her dying day, and till he himself was fifty years of age, give us aditional ground to hope that calumnuy or misconception has been at work in the story of Zainab?[37]

'এটা মনে রাখতে হবে যে, মুহাম্মদ নারীদের শোচনীয় অবস্থায় দায় প্রণোদিত হয়ে অধিকাংশ বিবাহ করেছিলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর পত্নীদের প্রায় সকলেই বিধবা ছিলেন। কেউই সৌন্দর্য বা ঐশ্বর্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন না। বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। এ তথ্য এবং তাঁর ৫০ বছর বয়ক্রম কালে খাদীজার মৃত্যু পর্যন্ত কেবল খাদীজার প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ অনুরাগ আমাদেরকে কি অতিরিক্ত প্রমাণ প্রদান করে না যে, তাঁর বিরুদ্ধে যায়নাব সংক্রান্ত কাহিনী ভুল বা হিংসা প্রসূত?'

মুনাফিক ও ইসলামের শত্রুরা নবী স.-এর নামে এ কাহিনী অপপ্রচার করে। অপপ্রচারকারীদের বর্ণনা সঠিকভাবে যাচাই না করে ঐতিহাসিক ওয়াকেদি এবং ইবনে তাবারী তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ এই বর্ণনাকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেন। প্রকৃতপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এই ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় না। আল-কুরআনের সকল মুফাসসির (ব্যাখ্যাকারী) এই বর্ণনাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মহানবী স.-এর ব্যাপারে এ ঘটনাটি একটি জঘন্য মিথ্যাচার। এর প্রমাণ-যায়নাব রা. ছিলেন মহানবী স.-এর ফুফাত বোন। ছোটবেলা থেকে যায়নাব তাঁর সামনে বড় হয়েছেন। আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণ ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনে যায়নাব তাঁর সামনে আসা-যাওয়া করতেন। যদি সত্যিই যায়নাবের সৌন্দর্য-লাবণ্য তাঁর মনে রেখাপাত করতো তবে তিনি কুমারী অবস্থায়ই তাকে বিবাহ করতে পারতেন। এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর মুক্তদাস যায়েদের সাথে তাকে বিবাহ দিয়ে এরপর তালাক নিয়ে বিবাহ করতে যাবেন কেন? তাছাড়া নবী স. যখন যায়নাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বলে অপপ্রচারকারীরা বলে থাকেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। তাঁর ঘরে ছিল আয়েশা ও হাফসার রা. মত যুবতী ও সুন্দরীসহ বিভিন্ন বয়সের ছয়জন স্ত্রী। এমতাবস্থায় তিনি কেন ৩৫/৩৮ বছর বয়স্কা যায়নাবের প্রতি আকৃষ্ট হতে যাবেন?

প্রকৃত বিষয়টি হচ্ছে জাহেলী যুগে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ছিল। কৃতদাসদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তাদের প্রতি ভয়ানক অবিচার করা হত। এছাড়াও বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের নিন্দনীয় কুপ্রথা সমাজে ব্যাপকভাবে চালু ছিল। মহানবী স. সমাজ থেকে তা উৎখাত করে ইসলামের বিধান মতে-আরব-অনারব, ধনী-দরিদ্র ও কৃতদাস-স্বাধীন মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই বরং সবাই সমান-একথা প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন। আর মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিধায়ক হল

তাকওয়া। যা কুরআনের ভাষায়– 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাবান যে অধিক আল্লাহ ভীরু।[৩৮] 'এ উদ্দেশ্যে মহানবী স. তাঁর ফুফাত বোন যায়নাব রা.-কে যায়েদের সঙ্গে বিবাহ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি নিজেই যায়নাবের ভাই আব্দুল্লাহর নিকট এ বিবাহের প্রস্তাব দেন। আব্দুল্লাহ প্রথমে রাজি হননি। কারণ যায়নাব ছিল অভিজাত কুরাইশ বংশের হাশেম গোত্রের মেয়ে। পক্ষান্তরে যায়েদ ছিল খাদীজা রা. এর কৃতদাস, যাকে নবী স. পরে মুক্ত করে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। অভিজাত বংশের কুমারীকে মুক্ত কৃতদাসের নিকট বিবাহ দেয়া সারা আরবের অভিজাত শ্রেণীর জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ছিল। কিন্তু নবী স. জাহেলী যুগের এই সব কুপ্রথা নির্মূল করে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর ছিলেন। আর সে কারণেই নিজ বংশের মধ্য থেকে এই অভিযান শুরু করতে মনস্থ করেন।

মহানবী স.-এর বারবার অনুরোধে আব্দুল্লাহ ও যায়নাব এ বিবাহে সম্মতি প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়-'আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা কোন মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।'[৩৯] এরপর যায়েদ ও যায়নাবের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। মহানবী স. নিজেই যায়েদের পক্ষ থেকে দেন মোহর পরিশোধ করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কারণ যায়নাব নিজ বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করতেন। যায়েদকে হেয় দৃষ্টিতে দেখতেন। যায়নাব প্রায়ই যায়েদকে বলতেন, 'আমি মুক্তি প্রাপ্ত নই'। এ সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী বলেন- Proud of her birth, and perhaps also of her beauty, her marriage with freedman rankled in her breast. Mutual aversion at last culminated in disgust.[40]

'উচ্চ বংশে জন্ম ও খুব সম্ভব সৌন্দর্যের জন্য মুক্তদাসের সাথে তার বিয়েতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পারস্পরিক বিতৃষ্ণা শেষ অবধি ঘৃণায় পর্যবসিত হয়।'

যায়নাবের এ ধরনের আচরণ যায়েদের জন্য অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। তখন যায়েদ মহানবী স.-এর নিকট তার স্ত্রীর আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করতেন এবং তালাক দেয়ার অনুমতি চাইতেন। প্রতিবারই নবী স. যায়েদকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, 'নিজের স্ত্রীকে তালাক দিওনা, আল্লাহকে ভয় কর।' আল-কুরআনে এ বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে-(হে মুহাম্মদ–)'তুমি যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে তাকে বলেছিলে-তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না, আল্লাহকে ভয় কর।[৪১] একপর্যায়ে যায়নাবের সাথে যায়েদের জীবন যাপন করা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। নবী স.-এর নির্দেশমত যায়েদ বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু যায়নাবের ব্যবহারের কোন পরিবর্তন হল না, বিধায় তিনি যায়নাবকে তালাক দিয়ে আলাদা হয়ে যান।

বিষয়টি জেনে নবী স. খুব ব্যথিত হন। কারণ তিনি যায়নাব ও তার ভাইকে অনেক বুঝিয়ে এ বিবাহ দিয়েছিলেন, যারা এই বিয়েতে রাজি ছিল না। ফলে এ বিষয়টি তাঁকে অনেক পীড়া দেয় এবং এজন্য তিনি নিজেকে দায়ী মনে করেন। সে সময় বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তরা সমাজে খুব

অবহেলিত হওয়ায় যায়নাবকে অন্য কোথাও বিবাহ দেয়া কঠিন ব্যাপার ছিল। উপরন্তু যায়নাব ছিল একজন মুক্ত দাসের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যাকে অভিজাত বংশের কোন পুরুষ বিবাহ করতে রাজি হত না। এদিকে পালিক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা সে সমাজে খুবই নিন্দনীয় কাজ গণ্য হওয়ায় নবী স. যায়নাবকে বিবাহে অনিচ্ছুক ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর মনের অনুভূতি প্রকাশ করে কুরআনে বলা হয়েছে, 'তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিয়েছেন, তুমি লোকভয় করলে অথচ আল্লাহকে ভয় করা তোমার জন্য অধিকতর সঙ্গত।'[৪২]

কিন্তু এ বিবাহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল- কারণ জাহেলী যুগে আরব সমাজে পালক পুত্রদেরকে নিজ পুত্রের মর্যাদা দেয়া হত। ঔরষজাত সন্তানের মতই তারা উত্তরাধিকারী গণ্য হত এবং তাদেরকে মৃতের সম্পত্তির অংশ প্রদান করা হত। আরব সমাজে এই নিয়ম এত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে তা বিলোপ করা সহজ ছিল না। অথচ এই রীতি ইসলামের বিবাহ, তালাক, পর্দা ও সম্পত্তি আইনের পরিপন্থী ছিল। পালক পুত্রের ব্যাপারে জাহেলী এই রীতি-নীতির মূল উৎপাটনের উদ্দেশ্যে স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা দেন, 'পোষ্যপুত্র যাদেরকে তোমরা পুত্র বল, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি, এসব তোমাদের মুখের কথা, আল্লাহ সত্য বলেন এবং তিনি সরল পথ নির্দেশ করেন।'[৪৩] কিন্তু আরবদেশে পালকপুত্রের এই কুপ্রথাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। মহানবী স.-এর মত উন্নত চরিত্র ও ঐশী প্রজ্ঞার অধিকারী মহান ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। তাই মহান আল্লাহ এই কুপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্য নবী স.-কে যায়নাবের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যায়েদ যখন তার সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার (নবী) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিবাহ করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।'[৪৪] আর আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার পরই নবী স. সকল সামাজিক বিদ্রূপ উপেক্ষা করে যায়নাব রা.-কে স্ত্রী হিসেবে বরণ করেন। কাজেই পাশ্চাত্যের সমালোচকগণ তাঁর এ বিবাহ সম্পর্কে যে বক্তব্য প্রচার করেন তা সঠিক নয়। এ সম্পর্কে Bosworth smith যথার্থই বলেছেন, But I am satisfied after a close examination of the circumstances of the case that it does not bear the interpretation usually placed upon it by christains. Any how it is certain that zaid if he had suspected, as christains have done, any thing in the nature of an intrigue on the prophet's part to alienate his wives affection from him, could not have served him as he did even to the day of his death with all the loyalty and devotion of a zealous disciple.[45]

'সকল দিক থেকে অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে আমার এই প্রত্যয় জন্মেছে যে, খৃস্টানগণ এই বিবাহ সম্পর্কে সচরাচর যে বক্তব্য দিয়ে থাকেন তা সত্য নয়। অন্তত এটুকু স্থির নিশ্চিত যে, যদি যায়েদ খৃস্টানদের ন্যায় এই সন্দেহ করতেন যে, নবী স. তাকে তার স্ত্রীর ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কোনরূপ চক্রান্তে লিপ্ত আছে, তাহলে যায়েদ তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত একান্ত অনুগত শিষ্যের ন্যায় এরূপ বিশ্বস্ততা ও অনুরাগের সাথে তাঁর সেবায় অনুগত থাকতে পারত না।'

৮. হযরত জুয়াইরিয়া রা.

হযরত জুয়াইরিয়া রা. ছিলেন বনু মুস্তালিক গোত্রের গোত্রপতি হারিছের কন্যা। তার পিতা ছিল ইসলামের চরম শত্রু, যিনি ৫ম হিজরীতে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে মুসলমানদের সাথে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে বনু মুস্তালিক পরাজিত হয় এবং হযরত জুয়াইরিয়াসহ বনু মুস্তালিকের প্রায় ছয়শত লোক যুদ্ধে বন্দী হয়। তার স্বামী যুদ্ধে নিহত হন। তৎকালীন প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের দাস-দাসী হিসেবে বণ্টন করা হতো। সে অনুযায়ী জুয়াইরিয়া রা. হযরত সাবিত ইবনে কায়েসের রা. ভাগে পড়েন। অর্থের বিনিময়ে তিনি সাবিতের কাছে মুক্তির আবেদন করলে সাবিত তাকে মুক্তি দিতে রাজি হন। কিন্তু মুক্তিপণের অর্থ তার নিকট না থাকায় সাহায্যের জন্য নবী স.-এর নিকট আসেন । আর ইতোমধ্যেই তিনি ইসলামে দাখিল হয়েছিলেন। আয়েশা রা. বলেন.......জুয়াইরিয়া মুক্তি লাভের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে সাহায্য কামনা করেন।....তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ স. আমি হারেস ইবনে আবু দিরারের কন্যা, আমার পিতা গোত্রের সরদার, আমি কী বিপদে পড়েছি তা আপনার অজানা নয়। আমি সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়েছি, আমার মুক্তিপণ আদায়ে আপনার সাহায্য কামনা করছি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আমি যদি তোমার জন্য আরো ভাল কিছুর ব্যবস্থা করি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল স. সেটা কি? তিনি বললেন, আমি তোমার পক্ষ হতে মুক্তিপণ আদায় করে তোমাকে বিবাহ করব। জুয়াইরিয়া বলেন, হে আল্লাহর রসূল আমি রাজি।'[৪৬] এরপর রসূল স. তাকে বিবাহ করেন। এ সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী বলেন-She petitioned Mohammed for the amount, which he immediately gave her. In recognition of this kindness and in gratitude for her liberty, she offered her hand to Mohammed, and they were married.[47]

তিনি মুহাম্মদের নিকট (মুক্তিপণের) নির্দিষ্ট অর্থের জন্য আবেদন জানালে তৎক্ষণাত তার আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল। এই করুণা ও তার স্বাধীনতা দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হিসেবে তিনি মুহাম্মদের নিকট নিজেকে পেশ করলেন আর এভাবে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।'

মহানবী স.-এর এ বিবাহের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এ বিবাহের ফলে মুস্তালিকের বন্দী একশত পরিবারের প্রায় ৬০০ ব্যক্তি বিনাপণে মুক্তি লাভ করে যাদের সকলেই ইসলামে দীক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, বনু মুস্তালিক ছিল আরবের একটি দুর্ধর্ষ দস্যুগোত্র। আরবের বেদুঈন জাতির উপর

তাদের অসাধারণ প্রভাব ছিল। তারা প্রায়ই মুসলমানদের বিরুদ্ধে দস্যুবৃত্তিতে যোগদান করত। কিন্তু হযরত জুয়াইরিয়া রা.-কে রসূল স. বিবাহের পর বনু মুস্তালিকগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করে। নবী স.-এর এই বিবাহের মাধ্যমে চিরশত্রু বনু মুস্তালিক আপনজনে পরিণত হয়। এই বিবাহের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে S.M. Madani *বলেন,* This marriage also, was a diplomatic measure, by which the Holy Prophet (S.A.W) won the hearts of the most diehard opponents of Islam.p-75...........This master stroke of diplomacy and political sagacity on the part of the Holy prophet (S.A.W) placated thousands of former enemies and non-believers. This martrimonial alliance, like other marriages were contracted, with a view to winning friends, and adherents for Islam and not for any sensual purpose this step won more friends than the sowrd.[48] 'এ বিবাহও ছিল কূটনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যার মাধ্যমে মহানবী স. চরম ইসলাম বিদ্বেষীদের হৃদয় জয় করেন। নবী স.-এর এই কূটনৈতিক ও বিচক্ষণতাপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হাজার হাজার সাবেক কাফের দুশমনদের শান্ত করে ফেলেছিল। এই বৈবাহিক সম্পর্ক অন্যান্য বিবাহের মত ইসলামের অনুসারী ও শুভাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধির জন্য ছিল, এতে যৌন উদ্দেশ্য ছিল না। আর এই পদক্ষেপ তরবারির পরিবর্তে অসংখ্য বন্ধু উপহার দিয়েছিল।'

৯. হযরত উম্মে হাবিবা রা.

উম্মে হাবিবা রা. ছিলেন মক্কার কাফের নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা। ইসলামের প্রথম দিকে তিনি স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে ইসলাম গ্রহণ করে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে তার স্বামী ইসলাম ত্যাগ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তিনি ইসলামের উপর অটল থাকেন। অল্পকাল পরই সেখানে তার স্বামী মারা যায়। নির্বাসিত উম্মে হাবিবা রা. দুটি সন্তানসহ অত্যন্ত নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়েন।

মহানবী স. এই ঘটনা শুনে খুব বিচলিত হন। উম্মে হাবিবার এই করুণ অবস্থা বিবেচনা করে তিনি বিবাহের পয়গাম দিয়ে তার এক সাহাবীকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে পাঠান। বাদশাহ নাজ্জাশী নবী স.-এর এই পয়গাম স্বীয় দাসী মারফত উম্মে হাবিবার নিকট পাঠান। উম্মে হাবিবা এই পয়গাম পাওয়ার পর এত খুশি হয় যে, পত্রবাহক দাসীকে নিজের হাতের স্বর্ণালংকার খুলে উপহার দেন। সেখানে নাজ্জাশী নিজেই মহানবী স.-এর সাথে উম্মে হাবীবার বিবাহ পড়ান এবং নবী স.-এর পক্ষ থেকে মোহর আদায় করেন। এরপর নাজ্জাশী বিশ্বস্ত লোক মারফত উম্মে হাবীবাকে মদীনায় পাঠান। এ বিবাহের সময় নবী স.-এর বয়স ছিল ৬০ আর উম্মে হাবীবার বয়স ছিল ৩৮ বছর।

মহানবী স.-এর এই বিবাহ ছিল গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক, যার ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এই বিবাহের ফলে আবু সুফিয়ান খুবই প্রভাবিত হন এবং তার মধ্যে আমূল

পরিবর্তন দেখা দেয়। মহানবী স. ও ইসলামের প্রতি তার শত্রুতা কমে যায় এবং তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। এছাড়াও এই বিবাহ মক্কাবাসীকে স্পষ্ট করে দেয় যে, মুহাম্মদ স. তাদের শত্রু নয় বরং তাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী। এই বিবাহের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে Fida Hussain Malik বলেন, This marriage was a pure blessings and yielded very good results. After this marriage Abu Sufyan grew less and less blatant in his hostility towards Islam and the Holy prophet, and soon after, Mecca, was conquered by the prophet. This marriage political sagacity, not for passion's sake, but for the advancement of Islam.[49]

'এই বিবাহ ছিল পুরোপরি একটি আশীর্বাদ এবং এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই বিবাহের পর ইসলাম ও মহানবীর প্রতি আবু সুফিয়ানের বৈরিতা কমে যায় এবং শীঘ্রই নবী কর্তৃক মক্কা বিজয় হয়। রাজনৈতিক বিচক্ষণতাজনিত এই বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের উন্নতি বিধান করা, এতে কোন ইন্দ্রিয় লালসা উদ্দেশ্য ছিল না।'

আল্লামা সফিউর রহমান বলেন, 'রসূলুল্লাহ আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করার পর আবু সুফিয়ান ইসলামের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করলেও কখনও রসূল স.-এর সামনে আসেননি। এমনকি পরবর্তীকালে তিনি ইসলামে দাখিল হন।'[৫০]

১০. হযরত সফিয়া রা.

হযরত সফিয়া রা. ছিলেন মদীনার ইহুদী গোত্র বনু নাযীর ও বনু কুরাইযার নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের মেয়ে। তার পিতা ছিলেন চরম ইসলাম বিদ্বেষী, যিনি মদিনা সনদের চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। খায়বারের অভিযানে তার পিতা ও স্বামী নিহত হয়। তিনি বন্দী হন। এই যুদ্ধের গনীমতের যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টনের সময় মহানবী স.-এর নিকট তাঁর সহচর দাহইয়া কালবী রা. একজন দাসীর আবেদন করলে তিনি বন্দী মেয়েদের থেকে পছন্দমত একজনকে গ্রহণের অনুমতি দেন। দাহইয়া কালবী সফিয়া রা.-কে পছন্দ করেন। কিন্তু সফিয়া রা. বংশমর্যাদার কারণে তার সাথে যেতে অস্বীকার করেন। তখন তিনি দাহইয়াকে অন্য বন্দিনী প্রদান করে সফিয়াকে বিনামুক্তিপণে মুক্ত করে স্বাধীন মেয়ে পুরুষদের সাথে নিজ গৃহে যেতে অনুমতি প্রদান করেন। মুক্তিপ্রাপ্তা সফিয়া নবী স.-কে জানান যে, তার পিতা, স্বামী ও নিকট আত্মীয়রা মৃত্যুবরণ করেছে এবং ইতোমধ্যেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। স্বজাতির কেউ তাকে ঠাঁই দেবে না। নিজ গোত্রে ফিরে গেলে ইসলাম ত্যাগে তাকে বাধ্য করা হবে। তাই তিনি নবী স.-এর আশ্রয়ে থাকার বিনীত আবেদন করেন। এ সময় কয়েকজন সাহাবী তার ব্যাপারে নবী স.-কে বলেন যে, তিনি বনু নযীর ও কুরাইযা গোত্রের সর্দারের মেয়ে, যে একমাত্র আপনারই যোগ্য। তার অবস্থা বিবেচনা করে নবী স. তাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য ৬০ বছর বয়সে বিবাহ করেন। নবী স.-এর এই বিবাহ ছিল একটি নিতান্তই মানবিকতাপূর্ণ মহৎ কাজ। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, Her

too, Mohammed generously liberated, and elevated to the position of his wife at her request.[51] 'তাকেও মুহাম্মদ স. উদারতার সঙ্গে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তার সনির্বন্ধ অনুরোধের জন্য তাকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করেছিলেন।'

মহানবী স.-এর করুণাজনিত বিবাহের রাজনৈতিক ফলাফলও ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এ বিবাহের ফলে মদীনার আশে-পাশের ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহুদীদের সাথে শত্রুতা প্রশমিত হয় এবং অনেক ইহুদী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আল্লামা সফিউর রহমান বলেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পর বনু নযীর ও বনু কুরাইযা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এমন প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না।'[৫২]

১১. হযরত মায়মুনা রা.

হযরত মায়মুনা ছিলেন কোরাইশদের অন্যতম নেতা মহানবী স.-এর চাচা হযরত আব্বাস রা.-এর শ্যালিকা এবং মহাবীর খালিদের খালা। তার পিতা হারিস ছিলেন বানু হাওয়াজিন গোত্রের নেতা। চাচা আব্বাসের প্রস্তাবে ও অনুরোধে ৬০ বছর বয়সে মহানবী স. ৫১ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা হযরত মায়মুনাকে বিবাহ করেন। নবী স.-এর সাথে বিবাহের পূর্বে তার দু'জায়গায় বিবাহ হয়। প্রথম স্বামী কর্তৃক তিনি তালাকপ্রাপ্তা হন এবং দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হন। মহানবী স.-এর এ বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল চাচা আব্বাস রা. এবং মহাবীর খালিদ রা.-এর সাথে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করে তাদেরকে ইসলামে দাখিল করানোর মাধ্যমে ইসলামের শক্তিবৃদ্ধি করা। এ বিবাহের গুরুত্ব সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, Maimuna, whom Mohammed married in Mecca, was his kins woman and was already above fifty. Her marriage with Mohammed besides providing for a poor relation the means of supports, gained over to the cause of Islam two famous men, Abbas and Kalid bin walid, the leader of koreish cavalry in the disastrous battle of Ohod, and in later times the conqueror of the Greeks.[53]

'মায়মুনাকে মুহাম্মদ মক্কায় বিবাহ করেছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর আত্মীয়া ও ৫০ উর্ধ ছিল তার বয়স। তাঁর এই বিবাহ কেবল এক দুঃস্থ আত্মীয়ার ভরণ-পোষণের জন্য ছিল না বরং এর ফলে দু'জন প্রখ্যাত ব্যক্তি আব্বাস এবং বিপর্যয়কারী উহুদ যুদ্ধে কুরাইশ অশ্বারোহী দলের নেতা ও পরবর্তী কালের গ্রীক বিজেতা খালিদ ইসলাম গ্রহণ করেন।'

১২. হযরত রায়হানা রা.

হযরত রায়হানা বিনতে শামুন ইহুদী গোত্র বানু নাযীরের মেয়ে ছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর প্রথম দিকে বানু কুরাইযা ও বানু নাযীরের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি যুদ্ধবন্দী হয়ে মদীনায় আসেন এবং অল্পকাল

পরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বিধবা ছিলেন। ইহুদীদের সাথে শত্রুতার অবসান ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৬০ বছর বয়সে মহানবী স. ৪১ বছর বয়স্কা রায়হানাকে বিবাহ করেন। এ বিবাহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে S.M Madani Abbasi বলেন, In this marriage too, the main consideration was rehabilitation of a widow in keeping with her social status and winning over the sympathies of the Jews, rather than any consideration of sensual enjoyment, as the Holy Prophet (SAW) was by now an old man and already having about a dozen wives of various ages.[54]

'এ বিবাহের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য ছিল, একজন বিধবাকে মর্যাদার সাথে পুনর্বাসন এবং ইহুদীদের সহানভূতি অর্জন। এতে ইন্দ্রিয় লালসা উদ্দেশ্য ছিল না। আর নবী স. তখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন এবং সে সময়ে তাঁর বিভিন্ন বয়সের প্রায় ১২ জন স্ত্রী ছিল।'

এ সম্পর্কে W.M. Watt বলেন, There may also have been political motives in the union with the Jewesses, Sufiyah and Rayhana.[55] 'সুফিয়া ও রায়হানাকে বিবাহের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে থাকতেও পারে।'

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, মহানবী স. তাকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

১৩. হযরত মারিয়া রা.

মহানবী স. হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মদীনার পার্শ্ববর্তী যে সকল রাষ্ট্রে পত্র প্রেরণ করে ইসলামের দাওয়াত দেন মিসর তার মধ্যে অন্যতম। সেখানকার শাসক ছিল মুকাওকিস। যদিও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি তবুও মহানবী স.-এর পত্রের উত্তরে তাঁর সম্মানার্থে বেশ কিছু উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। এসব উপঢৌকনের মধ্যে মারিয়া এবং শিরিন নামে দুজন খৃস্টান দাসী ছিল। তৎকালে কোন শাসকের পক্ষ থেকে এ ধরনের উপঢৌকন গ্রহণ না করা ছিল অসৌজন্যমূলক কাজ। তাই নবী স. মুকাওকিসের প্রেরিত উপহারগুলো গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে Antone wes-sete বলেন, In accordance with the custom of those days for rulers to give slaves as gifts, Muhammad received several slaves from the Muqawqis of EGYPT. of these he took Mariya as a concubine.[56]

'তৎকালীন সময়ে শাসকদের উদ্দেশ্যে দাসী উপহার পাঠানোর রীতি অনুযায়ী মুহাম্মদের নিকট ...সরের শাসক মুকাওকিস কতিপয় দাসী পাঠালে তন্মধ্যে তিনি মারিয়াকে দাসী হিসাবে গ্রহণ ... মারিয়া ও শিরিনকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালে তারা দুজনই ইসলাম গ্রহণ করেন। ...ক দাসী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং শিরিনকে তাঁর একজন সহচরের সাথে বিবাহ ...কে স্ত্রীর সমমর্যাদা দিয়েছিলেন। তার গর্ভে ইব্রাহীম নামে নবী স.-এর এক ... করেন।

মহানবী স.-এর এই বিবাহের মাধ্যমে মদীনার আশেপাশের খৃস্টান শাসকদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লেখিত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী স. রাজনৈতিক কারণে কয়েকজনকে বিবাহ করেন, এদের মধ্যে উম্মে হাবীবা, জুয়াইরিয়া, সফিয়া, রায়হানা, মায়মুনা ও মারিয়া রা. উল্লেখযোগ্য। করুণাজনিত কারণে তিনি কতিপয় বিবাহ করেন– সাওদা, যায়নাব বিনতে খুজাইমা ও উম্মে সালামা রা. এ পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বিবাহ করেন যায়নাব বিনতে জাহাশ রা.-কে। অতি ঘনিষ্ঠ সহচর আবুবকর ও ওমর রা.-এর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য আয়েশা ও হাফসা রা.-কে বিবাহ করেন। শুধুমাত্র হযরত খাদীজা রা.-কে বিবাহ করেন স্বাভাবিক নিয়মে।

মহানবী স.-এর বহুবিবাহের বিবিধ কারণ

মহানবী স.-এর বহুবিবাহের অনেকগুলো কারণ আছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কারণ তুলে ধরা হল।

১. নারীরা মানব সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা কোন অংশেই পুরুষের থেকে কম নয়। তাই মহানবী স. বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন যোগ্যতার মহিলাদের বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদের মাধ্যমে কিশোরী, যুবতী ও বৃদ্ধসহ সকল শ্রেণীর মহিলাদের মাঝে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করা। এ সম্পর্কে Abdul Hameed siddiqui বলেন, 'Muhammad (peace be on him) was the bearer of God's message not only for men but also for women. The women folk needed the Prophitic guidance, trinig-and instruction in the same way as the males. The Holy Prophet was fully alive to this need of Muslim society. He had, therefore, in the best enterest of the umma, endeavoured to create a new leadership amongst women, which, like its counterpart amongst men, could by precept and example, help the formation of new type of womanhood representing the teaching of Islam.....The Holy Prophet allowed some women, belonging to different social groups, having different tastes and tendencies and defferent intellectual standards to enter his house hold as his wives and then by his close personal contact nurture.[57]

মুহাম্মদ স. শুধু পুরুষদের রসূল ছিলেন না, বরং তিনি মহিলাদেরও রসূল ছিলেন। পুরুষদের মত মহিলাদেরও রিসালাতের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া তাঁর দায়িত্ব ছিল। এ ব্যাপারে নবী

স. পূর্ণ সচেতন ছিলেন। পুরুষদের মত মহিলাদের মধ্যেও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে তিনি প্রবল আগ্রহী ছিলেন। সে কারণে মহিলাদের মধ্যে তাঁর প্রতিনিধিত্ব তৈরির জন্য তিনি বিভিন্ন গোত্রে, বিভিন্ন রুচির, বিভিন্ন মানসিকতার ও বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানসম্পন্ন মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর গৃহে স্থান দেন।'

২. রসূল স.-এর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন যা সকলের পক্ষে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব ছিল না। ইসলামের পূর্ণতার জন্য তা জানা অপরিহার্য ছিল। তাছাড়া মহিলাদের একান্ত ব্যক্তিগত হাজারও সমস্যা, যেগুলো পুরুষের পক্ষে সমাধান বা ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয় সেগুলো জানাও একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তাই মহান আল্লাহ নবী স.-এর জন্য একাধিক বিবাহের ব্যবস্থা করেন যাতে লোকেরা তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনসহ ইসলাম ও মহিলা সংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধান বিস্তারিত জানতে পারে। আর তাঁর স্ত্রীগণ এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মহানবী স.-এর স্ত্রীগণের থেকে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ২৮২২টি এর মধ্যে হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন ২২১০টি, হযরত উম্মে সালামা ৩৭৮টি, উম্মে হাবীবা ৬৫টি, হযরত হাফসা রা. ৬০টি, হযরত মায়মুনা ৪৬টি মতান্তরে ৭৬টি, হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. ১১টি, হযরত সফিয়া রা. ১০টি, হযরত জুয়াইরিয়া রা. ৭টি ও হযরত সাওদা রা. ৫টি। এসব হাদীসের একটি বড় অংশ নবী স.-এর ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত। আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, 'নবী করীম স.-এর পবিত্র জীবনসঙ্গিনীগণ ইসলাম প্রচার-প্রসার ও দীনের তালীমের মহান লক্ষ অর্জনে তাঁর সাহায্যকারী ও মদদগার ছিলেন। যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে তারা শরিক হতেন, আহত ও পীড়িতদের চিকিৎসা ও সেবা করতেন। রসূল স.-এর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এক তৃতীয়াংশ এবং এছাড়া আরও বহুবিধ বিধি-বিধান ও শিক্ষামালা নবীর সহধর্মীনিদের অবদান ধন্য। মুসলমানরা এসব তাদের থেকেই শিখেছেন, স্মরণ রেখেছেন, অতঃপর তারা অন্যদেরকে তা বলেছেন ও শিখিয়েছেন।'[৫৮]

৩. তৎকালীন আরব সমাজে বিধবা সমস্যা খুব প্রকট ছিল। বিধবাগণ সমাজে চরম অবহেলিত ছিল। তাদেরকে কেউ বিবাহ করতে চাইত না। বিশেষ করে মহানবী স. মদীনায় হিজরতের পর পুরুষ মুসলমানগণের প্রায় অর্ধেক বিভিন্ন যুদ্ধে (বদর, উহুদ, বীর মাউনার ঘটনায়) শহীদ হন। ফলে মুসলিম বিধবা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। ইসলামে বিবাহ বহির্ভূত পরনারীর সংস্পর্শে আসা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হওয়ায় নবী স. বিধবাদের নৈতিকভাবে পবিত্র রাখার জন্য এবং সমাজ থেকে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা রোধে বিধবা বিবাহে উৎসাহিত করেন। এবং তিনি নিজে একজন কুমারী ছাড়া বাকী সকল বিবাহ করেন বিধবা। এ সম্পর্কে হাফেজ গোলাম সারওয়ার বলেন, 'It must be remembered that the death toll at Badr, Ohad and the muder of 77 teachers of religion by the treachery of the Arabs had widowed nearly half the Muslim women at Medina, and

Muhammad was not the only man who was contracting these marriages of protection and ncessity....These were no marriage of pleasure but of absolute and dire necessity.....Women could not be left to look after themselves and the punishment for fornication and adultery was respectively 100 strokes of the leather in public and death. What Muhammad was doing for the preservation of the morality of his people is interpreted as licentiousness by his opponents. Truly none are so blind as those who won't see.[59]

'মনে রাখতে হবে যে, বদর, উহুদ যুদ্ধে অনেক মুসলমানের শাহাদাত এবং আরবদের বিশ্বাসঘাতকতায় বীর মাউনায় ৭৭ জন ধর্মীয় শিক্ষককে হত্যা করার ফলে মদীনায় মুসলিম মহিলাদের অর্ধেক নিধবা হয়ে যায়। মুহাম্মদই একমাত্র পুরুষ হিসেবে এসব প্রয়োজনীয় ও নিরাপত্তাদায়ী বিবাহগুলো করেননি। ....এই বিবাহগুলো ভোগ-বিলাসিতার জন্য ছিল না, বরং তা ছিল নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ব্যভিচারের জন্য প্রকাশ্য ১০০ বেত্রাঘাত বা মৃত্যুর বিধান থাকায় এই নারীদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দেয়া যেত না। তাঁর অনুসারীদের নৈতিকতা রক্ষার জন্য মুহাম্মদ যা করেছিলেন তাকে তাঁর বিরোধীরা চরিত্রহীনতা বলে ব্যাখ্যা করে থাকে। নিশ্চয়ই এদের মত অজ্ঞ আর কেউ নেই।'

৪. মক্কার কাফের ও মুশরিকগণ রসূল স.-কে কবি, গণক, যাদুকর ও পাগল বলে আখ্যায়িত করত। কিন্তু রসূল স.-এর বহু বিবাহের মাধ্যমে তাঁর চরিত্র, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে লোকেরা ব্যাপকভাবে জানতে পারে। ফলে মক্কার কাফেরদের অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্কে J. Davenport বলেন, It is strongly corroborative of Mohammad's sincerity that earliest converts to Islam were his bosom friends and the people of his household, who being intimately acquainted with his private life, would not fail otherwise to have detected those discrepancies which more or less invariably exist between the pretensions a hypocritical deceiver and his actions at home.[60]

'মুহাম্মদের অকপটতার দৃঢ় প্রমাণ এই যে, প্রাথমিক মুসলমানগণ যে কেবল উন্নত প্রকৃতির লোক ছিলেন এরূপ নয়। তারা তাঁর পরম বন্ধু ও একান্নভুক্ত পরিজন ছিল না। এরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল। ভণ্ড প্রতারকের বাহ্যিক বাক্য ও স্বগৃহে নিজ কাজে যে নানাবিধ অসামঞ্জস্য দেখা যায় তাঁর এরূপ কিছু থাকলে তারা উপলব্ধি করতে সমর্থ হতো।'

৫. সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'Some of them may possibly have arisen from a desire for male offspring, for he was not a god, and may have felt the natural wish to leave sons behind him.'[61]

'কতিপয় বিবাহের উদ্দেশ্য সম্ভবত পুত্র সন্তান লাভের ইচ্ছা থেকে জন্ম লাভ করে থাকবে। কেননা তিনি দেবতা ছিলেন না। এবং স্বাভাবিকভাবে পুত্র উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে থাকবেন।'

৬. আল্লামা সফিউর রহমান বলেন, 'আরবে নিয়ম ছিল যে, তারা আত্মীয়তা সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দিত। জামাতা সম্পর্ক আরবদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জামাতার সাথে যুদ্ধ করাকে তারা মনে করে লজ্জাজনক। এ নিয়মের কারণে রসূল স. বিভিন্ন গোত্রের ইসলামের প্রতি শত্রুতার শক্তি খর্ব করার জন্য বিভিন্ন গোত্রের মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।'[৬২]

৭. মার্মাডিউক পিকথল বলেন, 'এক পত্নীক স্বামীত্বের গৌরবময় আদর্শ স্থাপনের পর সর্বকালের আদর্শ মানব বহুপত্নীক স্বামীদের এক মহান দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যার অনুসরণে বহুপত্নীক মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ পূণ্যময় জীবন যাপন করতে পারে।'

৮. পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে বংশগত বিরোধ ছিল প্রবল। এই সমস্যার প্রতিকারে মুহাম্মদ স. বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবার ও গোত্রসমূহের মধ্যে বিবাহ করে এই কলহ নিরসন করেন। ফলে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের মধ্যে গোত্রগত অনৈক্য ও বিদ্বেষ বিদূরিত হয়ে সমাজে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপিত হয়।

৯.The Encyclopidea of Relegion এ বলা হয়েছে- Muhammad himself is said to have had fourteen wives of concubines, of whom nine survived him, but for each of his marriages there was a social or political reason'. Thus he bound his two chief lieutenants Abu Bakr and Umar more closely to him by marrying their daughter's Aishah and Hafsah.[63]

'মুহাম্মদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তার ১৪ জন স্ত্রী বা দাসী ছিল, যাদের ৯ জন তার মৃত্যুর পর জীবিত ছিল, তার এ বিবাহগুলোর পিছনে সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণ ছিল। একইভাবে তার দুই সহচর আবু বকর ও ওমর এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য তিনি তাদের কন্যা আয়েশা ও হাফসাকে বিবাহ করেন'।

১০. যে কেউ ইসলামের ছায়াতলে আসলে ইসলাম তাকে পূর্ণমর্যাদা প্রদান করে। মহানবী স. বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রের মহিলাদেরকে বিবাহ করে তাই প্রমাণ করেছেন। মহানবী স. এর ৭ জন সহধর্মীনির অবস্থা এরূপ ছিল যে, যখন তাদের বিবাহ হয় তখন তাদের বয়স ছিল ৩০ উর্ধ এবং তাদের পূর্ব স্বামীর সন্তানাদিও ছিল, তাছাড়া তারা ছিল নিঃস্ব ও অসহায়। যদি তিনি নারী লিপ্সু হতেন তবে সব সুন্দরী, যুবতী ও সম্পদশালী মেয়েদের বিবাহ করতেন। এসব নিঃস্ব, বয়স্কা ও বিধবাদের বিবাহ করতেন না। বিশেষ করে মদীনার রাষ্ট্রপতি এবং তৎকালীন বিশ্বের নতুন শক্তি হিসেবে আরবের সর্বত্র যখন তাঁর জয়গান ছড়িয়ে পড়ে তখন তিনি ইচ্ছা করলে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদেরকে বিবাহ করতে পারতেন। এটা তাঁর জন্য অতি

নগণ্য ব্যাপার ছিল। তিনি নারী লিপ্সু হলে এ সুযোগ হাত ছাড়া করতেন না। রসূল স. যদি যথার্থই নারী লিপ্সু হন তবে মক্কায় কাফেররা কেন তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনল না অথচ তারা তাঁর দোষ অন্বেষণে সদা তৎপর ছিল? তাই তাঁর বিরুদ্ধে নারীলিপ্সুতার অপবাদ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক। এ সম্পর্কে আমীর আলী যথার্থই বলেছেন, Truer knowledge of history and more corr ect appreciation of facts, instead of proving him to be a self-dulgent libertines, would conclusively establish that the man poor and without resource himself, when he under took the burden of suppprt-ing the women whom he married in strict accordance with the old patri-archal institution was under going a self-sacrifice of no linght a charac-ter.[64]

'ইতিহাসের প্রকৃত জ্ঞান ও পরিস্থিতির অধিকতর সঠিক মূল্যায়ন তাঁকে আত্মতুষ্ট একজন কামুক প্রমাণ না করে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে, তিনি পুরাতন গোষ্ঠীপতিদের প্রথানুসারে বিবাহিত স্ত্রীদের ভরণ পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন অথচ নিজে ছিলেন দরিদ্র ও সম্বলহীন। তখন তিনি চটুল নয় এমন চরিত্রের আত্মৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন।'

রসূল স. এর চার এর অধিক বিবাহের কারণ ঃ

মহানবী স. মুসলমানদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে সর্বোচ্চ চারটি বিবাহ নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু নিজের বেলায় তা পালন না করে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে পাশ্চাত্যের ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মযাজকগণ সমালোচনা করে বলেছেন, মুহাম্মদ নিজের বেলায় বিবাহের যে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন শিষ্যদের প্রতি তা অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি একজন নারী লিপ্সু ছিলেন। এই অভিযোগের জবাব হচ্ছে, যারা মহানবী স. এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন তারা হয়ত একথা জানেন না যে, হিজরী ৮ম সালের পূর্বে আরব সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। যে কেউ নিজেদের ইচ্ছামত যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত। এক্ষেত্রে কোন সীমারেখা ছিল না। এমতাবস্থায় হিজরী ৮ম সালে মহান আল্লাহ মুসলমানদের জন্য বিবাহের চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করে দেন এবং শর্তসাপেক্ষে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেন। এই মর্মে আল্লাহর নির্দেশ-'নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন বা চারজনকে বিবাহ করবে। যদি আশংকা কর সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে।'[৬৫]
ক. হিজরী ৮ম সালের এই নির্দেশ জারির পূর্বে মহানবী স. সবগুলো বিবাহ করেছিলেন। এই প্রত্যাদেশ জারির পর তিনি আর কোন বিবাহ করেননি। তাই উপর্যুক্ত পটভূমিতে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অমূলক। প্রশ্ন হতে পারে উল্লেখিত নির্দেশ জারি হওয়ার পর যে সকল মুসলমানের চারের অধিক স্ত্রী ছিল তারা চারজনকে রেখে বাকীদেরকে তালাক দেন। কিন্তু উক্ত প্রত্যাদেশের পরও কেন তিনি চারজনকে রেখে বাকীদেরকে তালাক দিলেন না? এর উত্তর-তাঁর স্ত্রীগণ সাধারণ মহিলাদের মত নন। এই মর্মে কুরআনের বাণী-'হে নবীর পত্নীগণ, তোমরা অন্য সব নারীদের

মত নও।'[৬৬] উল্লেখ্য যে, মহানবী স. এর স্ত্রীগণ সমস্ত মু'মিনদের মা এবং তারা সমস্ত মু'মিনদের জন্য অবৈধ। এই মর্মে আল্লাহর নির্দেশ-'তোমরা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদেরকে কোন অবস্থাতেই বিবাহ করবে না।'[৬৭] তাই তিনি যদি চার জন স্ত্রী রেখে বাকিদেরকে তালাক দিতেন তবে তাদের প্রতি অবিচার করা হত। কারণ সারাটা জীবন তাদেরকে নিঃসঙ্গ থাকতে হত। অধিকন্তু তাঁর এ সব বিবাহের মূল কারণ ছিল অসহায় মহিলাদের বিবাহ করার মাধ্যমে আশ্রয় প্রদান। এমতাবস্থায় তাদেরকে তালাক দেয়া হত অত্যন্ত অমানবিক। এ সম্পর্কে এস এম মাদানী বলেন-The Quranic law restricting the number of wives to four came in 8 A.H. and the Holy Prophet (SAW) had married all of his wives before this date. He was directed by God to keep those whom he had already married and not to marry anymore. If he divorced any of his wives or after his demise when they became widows as some of them did become, they could not be married. Out of regard for the Holy Prophet (SAW) no Muslim could even think of marrying them. And for this reason they were called Ummul Momenin or mothers of Muslims. This was all the special law on this subject revealed by Allah.[68]

'চার স্ত্রী সীমা নির্ধারণ সম্পর্কিত কুরআনের বিধান নাযিল হয় ৮ম হিজরীতে এবং নবী স. এই সময়ের পূর্বেই তাঁর সকল স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি পূর্বে যে সব স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে বহাল রাখতে এবং নতুন করে বিবাহ না করতে সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হয়েছিলেন। যদি নবী স. তাঁর স্ত্রীদের কাউকে তালাক দিতেন অথবা তাঁর মৃত্যুর পর যখন তাঁরা বিধবা হয়েছেন, তখন তাদের অন্যত্র বিবাহের সুযোগ ছিল না। আর নবীর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোন মুসলমান তাদেরকে বিবাহের চিন্তাও করতো না। আর এটা এই কারণে যে, তারা উম্মুল মু'মিনীন (মু'মিনদের মা) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। এগুলো ছিল নবীর প্রতি আল্লাহর বিশেষ বিধান।'

খ. মুসলামনগণ (একসাথে) চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না-মহান আল্লাহ এ সীমা রেখা নির্ধারণ করলেও মহানবী স. কে এই নিদের্শের আওতামুক্ত রাখেন। এটা মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত। এই মর্মে আল্লাহ বলেন-'হে নবী আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার সেই স্ত্রীগণ যাদের তুমি মোহর প্রদান করেছ এবং হালাল করেছি ফাই (অতিরিক্ত) হিসেবে আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন। তন্মধ্যে হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে সেই সকল নারীদেরকে এবং বিবাহের জন্য হালাল করেছি তোমার চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামার কন্যা, ও খালার কন্যাকে যারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করেছে। এবং কোন মু'মিন নারী নবীর জন্য নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে শুধুমাত্র তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়। যাতে করে তোমার কোন অসুবিধা না হয়।'[৬৯]

গ. মহান আল্লাহর রসূল স. কে এই বিষয়ে অনুমতি দেয়ার পিছনে বিশেষ কারণ হল-রসূল স. সাধারণ মানুষ থেকে শারীরিকভাবে অনেক বেশী শক্তি-সামর্থের অধিকারী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে কাতাদা রা. হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'নবী স. (কখনও) একই রাত্রিতে তাঁর দশজন স্ত্রীর সবার সাথে মিলিত হতেন। তাঁকে ত্রিশজন পুরুষের সমান যৌন ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।[৭০] রসূল স. এর বিশেষ শারীরিক সামর্থ্যের আরেকটি প্রমাণ রসূল স. সাওমে বেসাল[৭১] রাখতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, 'একবার রসূল স. রমযান মাসে সাওমে বেসাল করলেন, অন্যেরাও (তাঁকে অনুসরণে) সাওমে বেসাল শুরু করল, তখন রসূল স. তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তাঁকে বলা হল-আপনিতো স্বয়ং সাওমে বেসাল করছেন অথচ আমাদেরকে কেন নিষেধ করছেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদের মতো নই, আমাকে পানাহার করানো হয়।'[৭২]

ঘ. মহানবী স. সাধারণ মানুষের মত মানুষ ছিলেন না। মহান আল্লাহ তাঁকে রসূল হিসেবে বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট দান করেন, যা অন্যদেরকে দান করেননি। চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণের বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত। আর এমন অনেক আইন বা বিধান আছে যেগুলো সাধারণের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু মহান ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য নয়। মুহাম্মদ স. এর বিষয়টিও এরূপ, তিনি অনেক ক্ষেত্রেই জাগতিক আইনের ঊর্ধে ছিলেন। তাঁর চারের অধিক বিবাহের বিষয়টি এ পর্যায়ভুক্ত।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

নবী রসূলগণের মধ্যে হযরত ইয়াকুব ও মূসার আ. ৪ জন করে স্ত্রী ছিল। হযরত দাউদ আ. এর ১৯ মতান্তরে ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। হযরত সুলাইমান আ. এর ১০০ মতান্তরে ৭০০ জন স্ত্রী ও ৩০০ দাসী ছিল।

মহাভারতে একস্থলে উল্লেখিত হয়েছে-শ্রী কৃষ্ণের ১০১৬ জন স্ত্রী ছিল, অন্যত্র বলা হয়েছে-কৃষ্ণের ১৬০০ স্ত্রী ছিল।

Encyclopaedia Biblica তে এসেছে- A common jews could take as many as four wives and a king up to eighteen.[73] একজন সাধারণ ইহুদী চারজন আর রাজা ১৮ জন স্ত্রী রাখতে পারত।'

History of European Morals তে E.H. Lechy বলেন-২৩তম জন বিশপ খোদ নিজ মা-বোনের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ক্যান্টারবেরীর লাট পাদ্রী ১১৭১ খৃষ্টাব্দে ১৭টি অবৈধ সন্তানের জনক হন। স্পেনের এক পাদ্রী ১১৩০ খৃষ্টাব্দে ৭০ টি দাসী রক্ষিতা রাখেন। ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে হেনরী ৩য় সেসরের পাদ্রী ৬০ টি অবৈধ সন্তানের জন্ম দেন।...তাদের ব্যভিচারের কাহিনী ভুরি ভুরি বিদ্যমান। অস্পৃশ্যদের আশ্রম আর আশ্রম ছিল না। বরং তা ছিল ব্যভিচার আর পাপাচারের বীভৎস আখড়া। পাপাচারের উন্মাদনায় মাহরাম ও গায়ের মাহরাম বাছ বিচার ছেড়ে গিয়েছিল ফলে নিজ মা বোনদের থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে পাদ্রীদের জন্য বারবার আইন প্রণয়ন কর

প্রয়োজন হয়ে পড়ে।......খোদ ত্রানকর্তাদেরই ছিল এই অবস্থা। তারাই ছিল সবচেয়ে দূরাচার ও পাপীষ্ঠ।[৭৪]

অলোক বাবু লিখেছেন-'মৎস পুরাণ অনুযায়ী-শতরুপা ব্রহ্মার কন্যা। কিন্তু ব্রহ্মা নিজ কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে অযাচারে লিপ্ত হন।........যৌন জীবনে দেবতাদের কোনরূপ সংযম ছিল না..আবার ঋগেদে দেখি রুদ্রদেব তার নিজ কন্যা উষার সঙ্গে অযাচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। পৌরণিক যুগে বিষ্ণু পরস্ত্রী বন্দা ও তুলসীর সতীত্বনাশ করেছিলেন।[৭৫]

মহানবী স. এর সমসাময়িক কালের বিশ্বের রাজা-বাদশাহ ও সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে-তারা বহু স্ত্রী গ্রহণ ছাড়াও ইচ্ছামত ব্যাপক সংখ্যক যৌনদাসী রাখতেন। উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ সমালোচনার উর্ধে থাকলে শুধু এককভাবে মহানবী স.-এর সমালোচনা কি উদ্দেশ্যমূলক ও বিদ্বেষপ্রসূত নয়? এই অন্যায় একমুখি সমালোচনার প্রতিবাদ করে প্রখ্যাত মনীষী R.C. Bodley এ সমালোচকদের উদ্দেশ্যে বলেন- 'মুহাম্মদ স. এর দাম্পত্য জীবনকে যেমন পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে যাচাই করার প্রয়োজন নেই, তেমনি প্রয়োজন নেই সেই সব প্রথা ও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যেগুলো খৃষ্টবাদ জন্ম দিয়েছে। এরা পাশ্চাত্যের লোক নন, নন তারা খৃষ্টানও, বরং তারা এমন একদেশে এবং এমন এক যুগে জন্ম নিয়েছিলেন যেখানে তাদের নিজেদেরই নৈতিক ও চারিত্রিক বিধানের নিধন চলছিল। এতদসত্তেও আমেরিকা ও ইউরোপের নৈতিক ও চারিত্রিক বিধানকে আরবদের নৈতিক ও চারিত্রিক বিধানের চেয়ে উত্তম ভাবার কোন কারণ নেই। ....অতএব তাদের অপরের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে কটুক্তি করা থেকে বিরত থাকাই ভালো বোধ করি।'[৭৬]

পাশ্চাত্যের সমালোচকদের পক্ষপাতিত্বমূলক এ সমালোচনার জবাবে সৈয়দ আমীর আলী বলেনঃ-

Why did Moses marry more than one wife? Was he a moral or a sensual man for doing so? Why did David, 'The man after God's heart', indulge in unlimited polygamy? The answer is plain-each age has its on standard. What is Suited for one time is not suited for the other and we must not judge of the past by the standard of the present.[77]

'কেন মূসা একাধিক বিবাহ করেছিলেন? তিনি কি এরূপ করার জন্য নৈতিক বা কামুক মানব হয়ে গিয়েছিলেন? কেন দাউদ নবী, যিনি ছিলেন আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা, অগণিত বিবাহ করেছিলেন? এর উত্তর সহজ-প্রত্যেক যুগের নিজস্ব মানদণ্ড আছে। এক সময়ে যা উপযোগী অন্য সময়ে তা উপযোগী নয়। আমাদের উচিত নয় বর্তমানের মাপকাঠি দিয়ে অতীতের মূল্যায়ন করা।'

কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, নবী-রসূলগণ তাঁদের জীবনের কোন কাজ খেয়াল-খুশী মত করেননি, বরং তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ ছিল আল্লাহর নির্দেশে এবং দীনের স্বার্থে। মুহাম্মদ স. একজন রসূল ছিলেন। ইসলামের স্বার্থে ও আল্লাহর নির্দেশেই তিনি জীবনের প্রতিটি কাজ করেছিলেন। তাঁর জীবনের কোন কাজই তিনি নিজের খেয়াল খুশী মত করেননি।

তাই তাঁর বিবাহগুলো খেয়াল-খুশী মত ভোগ-বিলাস বা কামচরিতার্থের জন্য ছিল না। উল্লেখিত আলোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এরপরও অন্যায়ভাবে যারা তাঁর সমালোচনা করেছেন নিশ্চয়ই তারা বিদ্বেষপ্রসূত বা অজ্ঞতাবশত তা করেছেন। সত্যিকার অর্থে কোন ঐশ্বরিক ধর্মের অনুসারি কোন নবী-রসূল সম্পর্কে এ ধরনের সমালোচনা করতে পারে না। এতদ্‌সত্ত্বেও এইসব সমালোচকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়টি অধ্যয়ন করে প্রকৃত সত্য গ্রহণের অনুরোধ জানাব।

তথ্যপঞ্জি

১. আল কুরআন (৬৮:৪)
২. Michael H. Hart: The Hundred: A Ranking of the Most Influential Persons in History. Meera Publication,India, Page-33, 40
৩. Muammad Husain Haykal. The Life of Muhammad, Translated from the 8th edition, Ismail Raji al Faruqi, New Crescent Publishing, Delhi, India, 1998, P-285
৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল র., সহীহ আলবুখারী, কিতাবুল মানাকিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, হাদীস নং-৩৫৪৪, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৯৫
৫. Bosworth Smith, Mohammed and Mohammedanism, Third Edition London, 1889, p-289
৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল র., কিতাবুল ওহী, সহীহ আলবুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, হাদীস নং-৬, ১ম খণ্ড, পৃ-২৭
৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল র., কিতাবুন নিকাহ, সহীহ আলবুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, হাদীস নং- ৪৭৪৩, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫০
৮. P.K. Hitti, History of the Arabs, Tenth edition, 1970 P-120
৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল র., সহীহ আলবুখারী, কিতাবুল মানাকিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, হাদীস নং-৩৫৩৬, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৮৯
১০. Marmaduck Pickthall: The Glorious Quran, Introduction P-IV
১১. হাম্মুদা আব্দালাতি, ইসলামের রূপরেখা, দি হলি কোরাআন পাবলিশিং হাউস, বৈরুত, লেবানন, পৃঃ ২৮৫
১২. Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, Low price publications, Delhi, India(Repriented-1997) P-233
১৩. John Davenport, Mohammad and Teachings of Quran, Edited by Mohammad Amin, 3rd Impress, Lahore-1952, P-26
১৪. ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী র., জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৪, হাদীস নং-২২৯৯, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২০৭

১৫. ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী র., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩০২, পৃ-২০৮
১৬. Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, V-5, London, P-306
১৭. P.K. Hitti, ibid Page-120
১৮. Syed Ameer Ali, ibid, P-233-234
১৯. S.M Madani Abbasi, The Family of The Holy Prophet, Adam Publishers & Distributors, Delhi, India, first edition, 1984, P-66
২০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল র., সহীহ্ আলবুখারী, কিতাবুত তা'বীর, খণ্ড-৬, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, হাদীস নং-৬৫২৬, পৃ-২৯২
২১. Syed Ameer Ali, ibid, P-234
২২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সীরাতে সারওয়ারে আলম স., সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ-১৯৯৬ ৫ম খণ্ড, পৃ-১৩৩
২৩. SM Madani Abbasi, ibid, P-64
২৪. ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী র., জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৮, হাদীস নং-৩৮১৫, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ-৪০৮
২৫. ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লাম আল-নু'বালা, ২য় খণ্ড, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯৬, পৃ-১৮৩, তাবাকাত-৮/৭৭
২৬. ইবনে হাজর আল-আসকালানী, আল ইসাবা, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯৫ ৮ম খণ্ড, পৃ-২৩৩
২৭. ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আয-যাহাবী, সীয়ারু আ'লাম আল-নু'বালা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮৫
২৮. তাযকিরাতুল হুফফায, বৈরুত, লেবানন (প্রথম খণ্ড), পৃঃ২৭-২৮
২৯. Maulana Muhammad Ali, Muhammad The Prophet, (Fourth Revised edition) 1972, Lahore, P-222
৩০. Sexual Behaviour in Human Male. P-552,
৩১. Haykal, ibid, P-290-291
৩২. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ র., আসাহ্হুস্ সিয়ার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, অনূদিত, ১৯৯৬, পৃঃ-৬০২
৩৩. Abdul Hameed Siddiqui, The Life of Muhammad, Islamic Publications, Lahore, 10th edition, 1993, P-238
৩৪. W.Montgomery Watt, Muhammad Prophet and Stateman, Oxford University Press, 1961, P-156
৩৫. আনসার- মদীনার ঐ সকল মুসলমান যারা মহানবী স. ও মক্কা থেকে আগত মুসলমানদের আশ্রয় দিয়ে ইসলামের সার্বিক সহায়তা করেছিল।

৩৬. মুহাজির-ঐ সকল মুসলমান যারা ইসলামের জন্য নিজ মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় আগমন করেছিল।
৩৭. Bosworth Smith, ibid, p-115
৩৮. আল-কুরআন (৪৯ ঃ ১৩)
৩৯. আল কুরআন (৩৩:৩৬)
৪০. Syed Ameer Ali, ibid, P-235
৪১. আল কুরআন, (৩৩ঃ৩৭)
৪২. আল কুরআন, (৩৩ঃ৩৭)
৪৩. আল কুরআন, (৩৩ঃ৪)
৪৪. আল কুরআন, (৩৩ঃ ৩৭)।
৪৫. Bosworth Smith, ibid, P-114, 115-116
৪৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, অনুবাদ আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৩, পৃ-২৩৭
৪৭. Syed Ameer Ali, ibid, P-236
৪৮. SM Madani, ibid, P-75, 76
৪৯. Fida Hussain Malik, Wives of The Prophet, Adam Publishers &Distributors, Delhi, India, 1994, P-149
৫০. আল্লামা সফিউর রহমান, আররাহীকুল মাখতুম, অনুবাদ ও প্রকাশনা-খাদীজা আখতার রেজায়ী, আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ, ১৯৯৯, পৃ-৫৩৬
৫১. Syed Ameer Ali, ibid, P-237
৫২. আল্লামা সফিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৩৬
৫৩. Syed Ameer Ali, ibid, P-237
৫৪. SM Madani Abbasi, ibid, P-79
৫৫. W. M. Watt, Muhammad at Medina. Oxford University Press, 1956, P-288
৫৬. Antone wessete, A Modern Arabic Biography of Muhammad, Leiden, Netherlands, 1972, p-130
৫৭. Abdul Hameed siddiqui, ibid, P-239
৫৮. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী- নবীয়ে রহমত, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২, পৃ-৪৪৩
৫৯. Hafiz Ghulam Sarwar, Origin and Development of Islam : Life of Muhammad, Adam Publishers &Distributors, Delhi, India, 1996, P-446

৬০. John Davenport, ibid, P-7-8

৬১. Syed Ameer Ali, ibid, P-237

৬২. আল্লামা সফিউর রহমান, প্রাগুক্ত. পৃ-৫৩৫

৬৩. Mircea Eliade, The Encyclopidea of Religion, .New York, V-10, p-143

৬৪. Syed Ameer Ali, ibid, P-233

৬৫. আল কুরআন (৪ঃ৩)

৬৬. আল কুরআন (৩৩ঃ৩২)

৬৭. আল কুরআন (৩৩:৫৩)

৬৮. S M Madani Abbasi, ibid, P-61

৬৯. আল কুরআন, (৩৩ঃ৫০)

৭০. হাফিজ আবু শায়খ আল ইস্পাহানী র., আখলাকুন্ নবী স. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, অনুদিত ৩য় সংস্করণ, ২০০৪, হাদীস নং-৭০১, পৃ-৩৪১

৭১. সাওমে বেসাল হলো- 'দিবারাত্রি পানাহার বর্জন করে ক্রমাগত দুই থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত-রোযা রাখা'।

৭২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ র., সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, ৪র্থ খণ্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০১, অনুদিত, হাদীস নং-২৪৩০ পৃ-২৯

৭৩. Cheyne and Blake, Encyclopaedia Biblica, Birck (London), p -2946

৭৪. সাইয়েদ হামেদ আলী, একাধিক বিবাহ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ-৪১, থেকে গৃহীত উদ্ধৃতি

৭৫. মুন্সী মেহেরুল্লাহ, হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, প্রকাশনায় মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ২০০২ পৃ-১২৮-১২৯

৭৬. R.V.C Bodley, The Messenger, The Life of Mohammad, London, 1946, P-202-203

৭৭. Syed Ameer Ali, ibid, P-240

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬
বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৫, পৃষ্ঠা : ৬১-৭০

ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আবদুল আযীয আমের

পাঁচ.

শাস্তি ও কাফফারা

ফকীহদের ব্যাপক অংশের মত হলো, কাফফারা দণ্ডের সাথে সাজা বা শাস্তিও যুক্ত হতে পারে।[১] তাঁরা বলেন, কোন কোন অপরাধ এমন যেগুলোতে কাফফারা ও সংশোধনমূলক শাস্তি উভয়টিরই প্রত্যাশা থাকে। যেমন, কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করে, অথবা রমযানে দিনের বেলায় স্ত্রীসঙ্গম করে অথবা কেউ স্ত্রীর সাথে যিহার করে তখনই সেই ব্যক্তির উপর নির্দিষ্ট কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব। সেই ব্যক্তির উপর ওয়াজিব কাফফারা আদায় করার আগেই যদি স্ত্রীসঙ্গম করে এমতাবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের অপরাধ করার কারণে তার উপর সংশোধনমূলক দণ্ড ও কাফফারা উভয়টিরই প্রয়োগ হবে।

ইমাম শাফেয়ী র.-এর মতে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে মিথ্যা কসমের কাফফারার সাথে দণ্ডও যুক্ত হওয়াটা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কিন্তু হানাফীদের মতে মিথ্যা কসমের ক্ষেত্রে শুধু কাফফারা আবশ্যিক, এর সাথে দণ্ড যুক্ত করা আবশ্যিক নয়। অনুরূপ যে হত্যাকাণ্ডে রক্তপণ আদায় আবশ্যিক নয়, যেমন কোন হত্যাকাণ্ডে নিহতের উত্তরাধিকারীগণ যদি কিসাস ক্ষমা করে দেয় সেক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর রক্তপণ তথা 'দিয়্যত' আদায় করা আবশ্যিক এবং এক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর কাফফারা মুস্তাহাব। ইমাম মালেক র. বলেন, এ ধরনের অপরাধীকে একশ কুরা (বেত্রাঘাত) এবং এক বছরের জেল দিতে হবে। ইমাম মালেক র.-এর মতানুযায়ী দণ্ড কার্যকর করলেও দেখা যায় এতে শাস্তির সাথে কাফফারাও যুক্ত হতে পারে।[২]

কোন কোন ফকীহ ইচ্ছাকৃত সংশয়যুক্ত হত্যাকাণ্ডের শাস্তির ক্ষেত্রেও দণ্ড ও কাফফারা যুক্ত হওয়াকে আবশ্যিক মনে করেন। তাদের মতের দলিল হিসেবে তাঁরা বলেন, ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের কাফফারার মতো উপরে বর্ণিত কাফফারার বিষয়টিও আল্লাহর হক। কারণ এই কাফফারা শুধু হত্যাকাণ্ডের জন্যে আবশ্যিক করা হয়নি, আবশ্যিক করা হয়েছে এই কারণে যে হত্যাকাণ্ডের কারণে যে সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে তার প্রতিবিধান করা। অবশ্য ভুলবশত ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের শাস্তি ভিন্ন এবং তাতে কাফফারা আবশ্যিক নয়।

উল্লেখিত মতাবলম্বীগণ এ বিষয় থেকেও স্বপক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন যে, কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করে, কৃত অপরাধে যদি অপরাধীর দ্বারা কোন জিনিসের ক্ষতি না হয় তাহলে অপরাধী অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে বটে কিন্তু তার উপর কোন ধরনের কাফফারা আবশ্যিক হবে না। এর বিপরীতে অপরাধী অপরাধ কর্ম সম্পাদন করেনি কিন্তু তার দ্বারা প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে অপরাধীকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না কিন্তু কাফফারা অবশ্যই আদায় করতে হবে। বস্তুত রোযা বা ইহরামরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃত স্ত্রীসহবাস করায় যেমন কাফফারা ওয়াজিব হয় ভুলবশত স্বেচ্ছায় হত্যাকাণ্ডের কাফফারার বিষয়টিও তেমনি।[৩]

উপরের আলোচনা শেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে শাস্তি ও কাফফারা একই সাথে যুক্ত হতে পারে। যদি এই সংযুক্তির মধ্যে কোন ধরনের কল্যাণকর দিক থাকে। অবশ্য অধিকাংশ ফকীহদের মতে উপরের প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকলেও মূলনীতি হলো, যে অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে হদ ও কাফফারা আবশ্যিক নয় মূলত সেই অপরাধই তা'যিরের পর্যায়ভুক্ত।

তা'যির আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের হক

ফকীহগণ অন্যান্য অধিকার বা মৌলিক হক এর মতো তা'যিরকেও দুভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো সেই তা'যির যা আল্লাহর অধিকারভুক্ত আর অপরটি হলো মানুষের অধিকারভুক্ত।[৪]

আইনের দৃষ্টিতে আল্লাহর হক বা অধিকার বলতে বোঝায় যেসব বিষয়ের সাথে ব্যাপক গণমানুষের স্বার্থ জড়িত। অথবা যেসব বিষয়ে ব্যাপক গণমানুষের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করার ব্যাপার রয়েছে, কোন ব্যক্তি বিশেষের লাভ ক্ষতির সাথে যে বিষয় সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপক গণ মানুষের স্বার্থ, কল্যাণ অকল্যাণের বিষয়গুলোকেই ইসলামী শরীয়ত আল্লাহর হক বা অধিকার বলে অভিহিত করেছে। এগুলোকেই মানব রচিত আইনে 'পাবলিক রাইটস' বলা হয়ে থাকে।

কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন মন্দ কাজ করে যে ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোন শাস্তির বিধান নেই এবং উক্ত ব্যক্তির মন্দ কাজের দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বিশেষের কোন ক্ষতিও সাধিত হয়নি, তাহলে উক্ত মন্দ কাজের অপরাধে অপরাধীকে যে শাস্তি দেয়া হবে সেটি আল্লাহর হক (আল্লাহর অধিকার) ক্ষুণ্ন করার অপরাধ বলে পরিগণিত হবে। কেননা সমাজকে সব ধরনের মন্দ, অপরাধ ও ক্ষতিকর বিষয়াবলী থেকে মুক্ত রাখা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা শরীয়তের অপরিহার্য কাজের অন্যতম। এ আইনের উদ্দেশ্য হলো মানব সমাজকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা এবং গণমানুষের স্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন একক ব্যক্তি বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বলা হয় ব্যক্তি অধিকার বা নাগরিক অধিকার *(Private Right).*

তা'যিরাতের পর্যায়ভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে হক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) বা হক্কুল ইবাদের (গণ অধিকার) মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কিছু শাস্তি শুধুই হক্কুল্লাহ বিনষ্টের কারণে দেয়া হয়, হক্কুল

ইবাদের সাথে সেগুলোর সম্পর্ক নেই। যেমন স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগকারী, মদ্যপানকারী, শরীয়ত অনুমোদিত অসুবিধা ছাড়া রমযানের রোযা ত্যাগকারী এবং মদের আড্ডায় অংশগ্রহণ কিংবা ব্যবস্থাপনায় জড়িত থাকার অপরাধে ইসলামী শরয়ী আইনে যে শাস্তি দেয়া হয় সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই হক্কুল্লাহ লঙ্ঘিত হওয়ার বিষয়টিই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কারণ এ ধরনের অপরাধে ব্যাপক গণমানুষের ও সমাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্য এসব অপরাধ নির্মূল করে ব্যাপক গণমানুষ ও সমাজকে ক্ষতির আশঙ্কা থেকে সুরক্ষাই শাস্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্য। এসব অপরাধের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না, যার কারণে এটিকে আমরা ব্যক্তি বা গণ অধিকার ক্ষুণ্ণের অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে পারি।

অবশ্য কোন কোন সময় হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের মধ্যে এমন মিশ্রণ ঘটে যে হক্কুল্লাহ প্রাধান্য বিস্তার করে। যেমন কারোর পরস্ত্রীকে চুমু দেয়া, প্রেম নিবেদন করা কিংবা নির্জনে মিলিত হওয়ার (যার মধ্যে দৈহিক মিলনের প্রমাণ নেই) মতো অপরাধে যে শাস্তি দেয়া হয় তাতে হক্কুল ইবাদও রয়েছে। কিছু সংখ্যক ফকীহ এমত প্রকাশ করেছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে তা'যিরী শাস্তি শুধু হক্কুল ইবাদ তথা ব্যক্তি স্বার্থ ক্ষুণ্ণের অপরাধেই দেয়া হয়। যেমন কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক (নাবালেগ) বালক যদি কাউকে অশ্লীল গালি দেয় সে অপরাধে তাকে যে শাস্তি দেয়া হয় সেটি একান্তই ব্যক্তি অধিকার ক্ষুণ্ণের অপরাধ। কেননা নাবালেগ বালকের হক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর অধিকার পালনের উপযুক্ততা নেই।

কোন কোন তা'যিরী শাস্তির ক্ষেত্রে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ উভয়টিই কার্যকর ভূমিকা পালন করে কিন্তু এক্ষেত্রে হক্কুল ইবাদ প্রাধান্য বিস্তার করে। যেমন, কাউকে গালিগালাজ করা কিংবা কোন ব্যক্তির গায়ে হাত তোলার অপরাধে যে শাস্তি দেয়া হয় তা এমন পর্যায়ভুক্ত যাতে একদিকে ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং সেই সাথে এক ব্যক্তির মান সম্মান সমেত সামাজিক অবস্থানও ক্ষুণ্ণ হয়েছে, নয়তো সে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা একান্তই সেই ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপর দিকে এই অপরাধে আল্লাহর অধিকারেও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর সকল সৃষ্টিকুলকে অনর্থক কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা আল্লাহর অধিকার পালনের অন্তর্ভুক্ত।[৫]

হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ-এর মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব

হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ এর আবশ্যিক শাস্তির মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। নিম্নের কয়েকটি উদাহরণ এই দুই ধরনের শাস্তির মধ্যে পার্থক্যকে আরো সহজবোধ্য করবে।

১. কোন ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি ধার্য করা হয় কিংবা যে অপরাধে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের মিশ্রণ থাকলেও হক্কুল ইবাদের প্রাধান্য থাকে যেমন, কাউকে গালিগালাজ করা কিংবা কারো উপর হাত উঠানো এবং এর শাস্তি প্রয়োগের বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্তের অভিযোগের (complain) উপর নির্ভর করে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যখন প্রতিকারের দাবী করা হয়,

তখন এর প্রতিকার করা বিচারকের জন্যে আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সেই সাথে প্রতিকার প্রত্যাশী ব্যক্তি যতোক্ষণ পর্যন্ত তার বিচার ও শাস্তির জন্যে অবিচল থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কোন বিচারক এই মামলা খারিজ করতে পারবে না। এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে সমকালীন শাসকের পক্ষ থেকেও অপরাধীকে ক্ষমা করার ঘোষণা করা কিংবা ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে বাদীকে সুপারিশ করাও বৈধ নয়। এর বিপরীতে হুকুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তির শাস্তির ক্ষেত্রে সমকালীন শাসকের পক্ষ থেকে ক্ষমা ঘোষণা কিংবা ক্ষমার সুপারিশ উভয়ইটি বৈধ। কিন্তু ক্ষমা করা কিংবা অপরাধীর শাস্তি কমিয়ে ভিন্ন উপায়ে তার সংশোধনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এক বর্ণনায় রয়েছে, 'তোমরা আমার কাছে সুপারিশ করো যদিও আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর মুখ থেকে সেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করাবেন যে অভিপ্রায় তিনি পোষণ করেন।[৬]

দ্বিতীয় প্রকার তাযিরের শাস্তি প্রয়োগ সমকালীন শাসকের উপর ওয়াজিব তথা আবশ্যিক কি-না এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, যেসব শাস্তি সম্পর্কে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে সেসব শাস্তি প্রয়োগ করা শাসকের জন্য আবশ্যিক তথা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, এ ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করা শাসকের জন্যে আবশ্যিক নয়। তিনি প্রমাণ স্বরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেন, 'একদিন এক ব্যক্তি নবী করীম স.-এর কাছে এসে বললো, আমার কাছে এক মহিলা এসেছিল, সঙ্গম ছাড়া আর সব কিছুই আমি তার সাথে করেছি। নবীজী বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করোনি? লোকটি বললো, জী হ্যাঁ, আমি আপনাদের সাথে নামায আদায় করেছি। অতঃপর নবীজী স. এই আয়াত পাঠ করলেন, ইন্নাল হাসানাতি ইউযহিবনাস সাইয়্যেয়াত- 'নিশ্চয়ই ভালো কাজ মন্দকাজকে দূর করে দেয়।' ইমাম শাফেয়ী র. এই হাদীস থেকে উসূল গ্রহণ করেছেন। নবী করীম স. মদীনার আনসার সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তাদের ভালো কাজগুলোকে তোমরা গ্রহণ করো আর মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দাও।' ইমাম শাফেয়ী র. এই ঘটনাকেই প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, একবার একটি মোকদ্দমায় নবী করীম স. হযরত যোবায়ের রা.-এর পক্ষে এ সিদ্ধান্ত নিলে প্রতিপক্ষ তাঁর উদ্দেশ্যে বললো, ও! যোবায়ের তো আপনার ফুফাতো ভাই, তাই না? এর অর্থ ছিল আত্মীয়তার খাতিরে তিনি ইনসাফ না করে ফুফাতো ভাইয়ের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এ কথায় নবীজী স. লোকটির উপর ভীষণ মনোক্ষুণ্ন হন কিন্তু কোন শাস্তি দেননি।

হাম্বলী মাযহাবের কিছু সংখ্যক অনুসারীও অন্যান্য ফকীহরা বলেন, যেসব শাস্তির ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে সেসব শাস্তি প্রয়োগ করা আবশ্যিক। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীর মালিকানাধীন দাসীর সাথে কিংবা যৌথ মালিকানাধীন দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে এর শাস্তি প্রয়োগ অপরিহার্য। কিন্তু যেসব শাস্তির ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই সেসব

ক্ষেত্রে কল্যাণকর দিক হলো শাস্তি প্রয়োগ করা। কেননা শাস্তি প্রয়োগ ছাড়া অপরাধীকে অপরাধ থেকে বিরত রাখার আর কোন কার্যকর পন্থা যদি না থাকে তবে শাস্তি প্রয়োগ আবশ্যিক। কারণ হক্কুল্লাহর পর্যায়ভুক্ত বলে শাস্তি প্রয়োগ শরীয়ত নির্দেশিত আর শাস্তি প্রয়োগ করে মানুষকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করাই শরীয়তের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রেও হদ-এর মতো শাস্তি প্রয়োগ করা আবশ্যিক। তবে যদি এ বিষয়টি অনুধাবন করা যায় যে শাস্তি দেয়া ছাড়াই অপরাধীকে সংশোধন করা সম্ভব তাহলে শাস্তি প্রয়োগ আবশ্যিক নয়। এক্ষেত্রে শাসক ভালো মনে করলে শাস্তি ক্ষমা করে দিতে পারেন। উল্লেখিত ফকীহগণ ইমাম শাফেয়ীর র. হাদীস থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

এ কথা মনে রাখতে হবে উল্লেখিত মতভিন্নতা শুধু এমন শাস্তির ক্ষেত্রে যে শাস্তি হক্কুল্লাহর পর্যায়ভুক্ত। হক্কুল ইবাদ তথা ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি আবশ্যিক হয়ে পড়ে সে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমকালীন শাসক কিংবা বিচারকের বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই।

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি, হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি নির্ধারিত তা বাস্ত বায়ন করা শাসকের জন্যে অপরিহার্য। এক্ষেত্রে শাসকের কোন ধরনের ক্ষমা প্রদর্শন, কল্যাণ অন্বেষণ বা অপরাধীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা বৈধ নয়। অবশ্য শাসক যদি মনে করেন, অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়াটাই হবে বেশী যৌক্তিক অথবা শাসক যদি মনে করেন, শাস্তি দেয়া ছাড়াই সংশোধন সম্ভব তাহলে শাস্তি কার্যকর নাও করতে পারেন।

উপরে যে সাহাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তিনি এক মহিলার সাথে সঙ্গম ছাড়া আর সবকিছুই করেছিলেন, কিন্তু নবী করীম স. তাকে শাস্তি দেননি। কারণ তাকে কিন্তু অপরাধী হিসেবে পাকড়াও করা হয়নি বরং তিনি স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে সংশোধনের জন্য লজ্জাবনত হয়ে রসূল স.-এর দরবারে এসে আত্মস্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যার ফলে রসূল স. বুঝতে পেরেছিলেন তাকে সংশোধনের জন্যে শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ সে নিজেই অপরাধ থেকে বিরত থাকতে প্রস্তুত। আর যে ঘটনায় এক ব্যক্তি রসূল স.-এর ফয়সালা শুনে তাঁর বিচারের প্রতি কটাক্ষ করেছিল তাতে লোকটি রসূল স.-এর মর্যাদা ও ইনসাফের প্রতি সংশয় প্রকাশ করে তাঁর ব্যক্তি অধিকার ক্ষুণ্ন করেছিল। যেহেতু বিষয়টি হক্কুল ইবাদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিল তাই সেক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তির অধিকার রয়েছে তার প্রতি কেউ যদি অবিচার করে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার। অন্যভাবে বলা যায় লোকটি রসূল স.-এর ন্যায় বিচারের ব্যাপারে আক্রমণ করে নবীজী স.-এর ব্যক্তিসত্তাকে লক্ষবস্তুতে পরিণত করে, নবীজী তাঁর বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দেন।[৭]

আলোচনার এ পর্যায়ে একথাটাও মনে রাখতে হবে গণঅধিকার লঙ্ঘনের কারণে যে শাস্তি অবধারিত হয় সেই অপরাধীকে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় তাহলেও শাসক ইচ্ছা করলে সংশোধনের জন্যে অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন। কারণ সমাজকে অপরাধমুক্ত করা এবং অপরাধ প্রবণতা রোধ করার জন্য কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা শাসকের অধিকার। শাসক যদি মনে করেন ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম কিংবা শাস্তি প্রয়োগ ছাড়াও অপরাধীর সংশোধন সম্ভব তাহলে শাস্তি রহিত করতে পারেন।[৮]

২. হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদের মধ্যে একটা পার্থক্য এও রয়েছে যে, গণঅধিকার প্রশ্নে যে শাস্তি অপরাধীর উপর প্রয়োগ আবশ্যিক হয়ে পড়ে, তার মধ্যে মিশ্রণ হয় না। অর্থাৎ অপরাধের পুনরাবৃত্তিতে শাস্তিও পুনরায় প্রয়োগ হবে। যেমন কেউ যদি বিভিন্ন সময় কাউকে গালিগালাজ করে তাতে সাধারণত এটাই মনে করা হবে যে, বিচারক অপরাধীকে একাধিকবার শাস্তি দেবেন। কিন্তু হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি নির্ধারিত হয় তাতে এই পুনরাবৃত্তি হয় না, এতে শাস্তির মধ্যে সংযুক্তি হতে পারে। উদাহরণ, যদি কোন ব্যক্তি রমযান মাসে ইচ্ছা করে কয়েক দিন রোযা না রাখে তাহলে কয়েকটি বা সারা মাস রোযা ত্যাগ করার জন্যে তাকে একবারই শাস্তি দেয়া হবে।[৯]

বিখ্যাত ফিকহর কিতাব কাশশাফ আলকি'না-এ ভিন্ন একটি মতামতও বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি একাধিক অপরাধের অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং এসব অপরাধ একান্তই হক্কুল্লাহ আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেগুলো যদি একই পর্যায়ভুক্ত হয়, যেমন কোন ব্যক্তি পরনারীকে একাধিকবার চুমু দেয় অথবা অপরাধের পর্যায় যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমন কোন অজ্ঞাত পরিচয় নারীকে ভুলবশত চুমু দেয় আর অপর কাউকে ইচ্ছা করেই চুমু দেয় তাহলে উভয় অপরাধে একই শাস্তি কার্যকর হবে এবং এই শাস্তির মধ্যে মিশ্রণ হবে। যেমনটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ব্যভিচার একাধিকবার করলেও শাস্তি একবারই হয়ে থাকে।

অনুরূপ গণঅধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যেসব শাস্তি অপরিহার্য হয় এগুলোর মধ্যে একই ব্যক্তিকে একাধিকবার গালি দিলে অথবা বহুজনকে যেমন কোন পাড়া মহল্লা কিংবা গোষ্ঠীকে গালি দিলে শাস্তির প্রয়োগে মিশ্রণ হবে, যেমনটি হক্কুল্লাহর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেননা এসব ক্ষেত্রে শাস্তি কার্যকর করার উদ্দেশ্য হলো অপরাধীদের সংশোধন করা এবং তাদেরকে অপরাধের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত রাখা। তাতে একাধিক অপরাধে একাধিকবার শাস্তি প্রয়োগ জরুরী নয়। বস্তুত হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে হোক বা হক্কুল ইবাদ লঙ্ঘনের অপরাধে শাস্তি নির্ধারিত হোক এ ধরনের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা নেই।[১০]

৩. হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য এই যে, হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি অপরিহার্য হয় তা যে ব্যক্তির সামনে সংঘটিত হয় ইচ্ছা করলে সে ব্যক্তিই শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে। কেননা এই অপরাধ 'নাহি আনিল মুনকার' এর অন্তর্ভুক্ত। রসূল স. নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমাদের কেউ যদি তোমাদের সামনে কোন গর্হিত কাজ হতে দেখে, তাহলে সাধ্য থাকলে হাত দিয়ে বাধা দাও, তা সম্ভব না হলে মুখের দ্বারা বাধা দিতে চেষ্টা করো, তাও যদি সম্ভব না হয় তহালে গর্হিত কাজটিকে মনে মনে ঘৃণা করো, অবশ্য এটা ঈমানের দুর্বল পর্যায়।' অবশ্য অপরাধ কর্মটি যদি সম্পন্ন হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এই অপরাধের শাস্তি দ্রুত কার্যকর করার অধিকার শাসক বর্গের উপর বর্তাবে।

এর কারণ হলো, এই ধরনের অপরাধ যখন সংঘটিত হয় তখন সেটি 'নাহি আনিল মুনকারের' পর্যায়ে পড়ে এবং প্রত্যেক মানুষকেই 'নাহি আনিল মুনকারে' বাধা দেয়ার সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অপরাধ সংঘটিত হয়ে যাবার পর সেটির শাস্তি প্রয়োগ করাটা 'নাহি আনিল মুনকারে'র পর্যায়ে পড়ে না। কেননা, যে অপরাধটি সংঘটিত হয়ে গেছে, সেটিকে এখন আর রোধ করা সম্ভব নয়। বস্তুত এখন অপরাধের শাস্তি কার্যকর করার আর কোন বিকল্প নেই। কাজেই শাস্তি কার্যকর করার অধিকার সাধারণ মানুষের উপর বর্তায় না। তা একান্তই শাসক বর্গের উপর বর্তায় এবং এটা শাসকদেরই কর্তব্য ও দায়িত্ব। আমার মনে হয় অপরাধ সংঘটিত হতে দেখে সেটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা বা প্রতিরোধ করাটা অপরাধের সূচনাক্ষণমাত্র, সেটিকে তখনো অপরাধ বলা যায় না। সাধ্য মতো অপরাধ কর্ম থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। এই গণদায়িত্ব শুধু সেই সব অপরাধের ক্ষেত্রে যেগুলো একান্তই হক্কুল্লাহর পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু যেসব অপরাধ গণঅধিকারের পর্যায়ভুক্ত সেই অপরাধের শাস্তি অকুস্থলেই কার্যকর করার অধিকার জনসাধারণের নেই। কেননা এ ধরনের অপরাধের শাস্তি প্রয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাবীর উপর নির্ভর করে। শাসক কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর কারো জন্যে গণঅধিকার লঙ্ঘনের অপরাধের শাস্তি প্রয়োগের অধিকার নেই। অবশ্য বাদী এবং বিবাদী উভয় মিলে যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে সালিশ (ARBITER) নির্ধারণ করে তাহলে সেই ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

অবশ্য এক্ষেত্রে এ ধরনের একটি অভিমত রয়েছে যে, গণঅধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি অবধারিত সেই শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কিসাসের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে ঠিক তেমনটি হবে। বস্তুত এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এ ধরনের অপরাধে শাস্তি প্রয়োগের বিষয়টি প্রকৃত পক্ষে শাসকের দায়িত্ব। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা দেয়াটা হবে সীমা লঙ্ঘনের নামান্তর। কেননা, তা'যির এমন ধরনের শাস্তিকেই বলা হয়ে থাকে, হদ বা কিসাসের মতো যার সীমা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নয়। এটিকে কিসাসের সাথে তুলনা করাটাই হবে ভুল। কেননা কিসাস শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি। তাতে কারো পক্ষে হ্রাস বৃদ্ধি করার অধিকার নেই।[১১] আমার মতে শেষোক্ত মতই যুক্তির নিরীখে উত্তীর্ণ এবং শরীয়তের চেতনার সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি যেমন ভারসাম্যপূর্ণ তেমনি অপরাধীর উপর জুলুমের অবকাশও থাকে না। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রয়োগের অধিকার দিলে সে অবশ্যই শাস্তি প্রয়োগে সীমালঙ্ঘন করবে। কারণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রই এক্ষেত্রে উত্তেজিত ও আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হবে, খুব কম লোকের পক্ষেই এক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্ভব।

৪. হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরেকটি পার্থক্য হলো, গণ অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি আবশ্যিক হয় তাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অধিকার তার অবর্তমানে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। পক্ষান্তরে অপরাধীর অপরাধ তার উত্তরাধিকারীদের দিকে সম্প্রসারিত হয় না। বিষয়টা আরো বিশদভাবে বললে এভাবে বলা যায়, কোন ক্ষতিগ্রস্ত

ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারীগণ শাস্তি প্রয়োগের দাবী করতে পারে কিন্তু অপরাধী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারীদের উপর শাস্তি প্রয়োগের দাবী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার উত্তরাধিকারীগণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে যে শাস্তি হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে নির্ধারিত হয় তা উত্তরাধিকারীদের দিকে সম্প্রসারিত হয় না। কারণ হক্কুল্লাহর কোন ওয়ারিস হয় না। এ কারণে হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধীর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীদের শাস্তি দেয়া যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণও শাস্তি প্রয়োগের দাবী করতে পারবে না। অপরাধীর মৃত্যুতে শাস্তি অকার্যকর হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তো পরিষ্কার। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি জীবিত থাকলেও শাস্তি প্রযুক্ত হবে না। কেননা হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে যে শাস্তি অবধারিত হয় সেটির কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাবীর উপর নির্ভরশীল নয় তাই তার উত্তরাধিকারীদের শাস্তি প্রয়োগের দাবী করা এক্ষেত্রে অবান্তর।[১২]

হক্কুল্লাহ লঙ্ঘনের অপরাধে প্রয়োগযোগ্য শাস্তি এবং হক্কুল ইবাদ লঙ্ঘনের অপরাধে প্রয়োগযোগ্য শাস্তির মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্টের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ফিকহর কিতাব সমূহে যা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো আমরা উপরে আলোচনা করেছি। এই দুধরনের অপরাধের বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র সর্বজন স্বীকৃত। কেননা নিসন্দেহে বলা যায় কোন কোন অপরাধ এমন যেগুলো ব্যক্তির চেয়ে সমাজকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার এগুলোর মধ্যে কিছু অপরাধ এমনও রয়েছে যেগুলো সমাজের চেয়ে ব্যক্তিকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমার দৃষ্টিতে এমন কোন অপরাধ নেই সমাজের স্বার্থের সাথে যার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। যার দ্বারা সমাজের মান মর্যাদায় কোন প্রভাব বিস্তার করে না, অথবা যার শাস্তি প্রয়োগের দ্বারা সমাজের কোন কল্যাণ হয় না। অথবা অপরাধীকে বিনা বিচারে ছেড়ে দেয়া সমাজের জন্যে উপকারী বিবেচিত হয়। যেমন কাউকে প্রহার করা শুধু ব্যক্তি অধিকারকেই খর্ব করা হয় না বরং সামাজিক অধিকারও খর্ব করা হয়। সমাজের প্রত্যেক সদস্য বা নাগরিকের কর্তব্য হলো, প্রত্যেকে কাজকর্মে একটা নীতি মেনে চলবে এবং অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকারের সীমানায় অবস্থান করবে। কেউ যদি কাউকে গালি দেয় কিংবা হুমকি ধমকি দেয় তাহলে সে সমাজের সেই অধিকারকে বিনষ্ট করে, যাকে বলা হয় হক্কুল্লাহ বা গণঅধিকার। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন ধরনের কষ্ট না দেয়াটাই হক্কুল্লাহ। এ ধরনের অপরাধীর শাস্তি হওয়াটা জরুরী যাতে অপরাধী নিজে থেকেই অপরাধ থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদের জন্যে এই শাস্তি হয় দৃষ্টান্ত আর সাধারণ মানুষ বোধ করতে পারে নিরাপত্তা। ফলে সমাজে হ্রাস পায় অপরাধ প্রবণতা। যদি এ ধরনের অপরাধী কিংবা সীমালঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেয়া না হয় তাহলে এ ধরনের অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে যাবে আর অন্যরা অপরাধ কর্মে আসকারা পাবে। এর ফলে গণমানুষের মধ্যে দেখা দেবে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা। বেআইনী কাজকে তারা স্বাভাবিক ঘটনা মনে করতে থাকবে। তাতে অপরাধ সমাজকে গ্রাস করে ফেলবে। এভাবে হক্কুল্লাহ বরবাদ হয়ে যাবে।

প্রমাণপঞ্জি :

১. কাফফারা এক ধরনের ইবাদত। এমন কোন কারণে যদি কাফফারা ওয়াজিব হয় বা গোনাহর পর্যায়ভুক্ত হয় তাহলে সেই কাফফারা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন যে ব্যক্তি দৈহিকভাবে রোযা রাখতে অক্ষম তাকে রোযার বদলে কাফফারা স্বরূপ অসহায় নিস্ব লোকদের আহার করাতে হয়। কিন্তু কাফফারা যদি কোন গোনাহর কারণে ওয়াজিব হয় তাহলে সেই কাফফারাকে নির্ভেজাল শাস্তি বলে। যেমন ভুলবশত হত্যাকাণ্ড কিংবা স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করে যিহার করার কারণে শাস্তি স্বরূপ ওয়াজিব কাফফারা। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, কাফফারা ইবাদত ও শাস্তির মাঝামাঝি একটি জিনিস। কেননা, কাফফারা এমন অপরাধে ওয়াজিব হয়ে থাকে যেসব বিষয় নিরেট মুবাহ্ বা নিরেট অপরাধের মাঝামাঝি পর্যায়ের কর্ম। উদাহরণত বলা যায়, আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নে জল্লাদের হত্যাকাণ্ডে তার উপর কোন কাফফারা ওয়াজিব হয় না। অনুরূপ স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর উপরও কোন কাফফারা নেই। কিন্তু ভুলবশত হত্যাকাণ্ডে কাফফারা রয়েছে। কারণ এখানে হত্যাকাণ্ডটি অপরাধ হিসেবে সংঘটিত হয়নি কিন্তু হত্যাকাণ্ডটি যে ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়ে গেছে সেই ব্যক্তিটি ছিলো নিরাপত্তা প্রাপ্ত। কেউ কেউ কাফফারাকে জরিমানার অনুরূপ মনে করেন। কেননা কাফফারা কখনো আর্থিক জরিমানার আদলে শাস্তিস্বরূপ হয়ে থাকে, আবার কখনো ভর্তুকির সূরতে এক ধরনের আর্থিক বদলা হয়ে থাকে, যখন কোন ক্ষতির বিপরীতে কাফফারা আদায় করা হয়। কাফফারা কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তি ও প্রতিদান উভয়ই হয়ে থাকে। আল মাবসুত সুরাখসী, খণ্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৮৬, আততাশরিঈল জিনাইল ইসলামী, পৃষ্ঠা-১৩১।

২. তাবসারাতুল হুক্কাম, আলী হামেশ ফাতাহ্ আল আলী আল মালিক খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬৬-৬৭, নেহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৭২, ১৭৩।

৩. কাশশাফুলকি'না মাতানিল আকনা' খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৭২, ৭৩।

৪. কোন কোন ফকীহ্ আট প্রকার হক্কুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। (১) একান্তইবাদত যেমন ঈমান (২) শাস্তি যেমন হদ। (৩) এই ধরনের শাস্তি যেগুলো মানুষকে অনাত্মীয় ঘোষণা করে, যেমন– মীরাস (উত্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিত করণ। (৪) এই ধরনেরর অধিকার যেগুলো শাস্তি ও ইবাদত উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করে। অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে শাস্তিও ইবাদত উভয়টি পাওয়া যায়। (৫) সেইসব ইবাদত যেগুলোর মধ্যে মানুষের উপর আর্থিক দায়িত্বভার থাকে যেমন সাদকা ফিতরা। (৬) সেই সব আর্থিক কর্তব্য পালন যেগুলোর মধ্যে ইবাদতের সংশ্লিষ্টতাও রয়েছে যেমন- উশর। (৭) সেইসব আর্থিক কর্তব্য পালন যেগুলোর মধ্যে একধরনের শাস্তির আভাস রয়েছে যেমন– খারাজ আদায়। (৮) সেইসব অধিকার যেগুলো নিজেরাই অস্তিত্বমান থাকে যেমন খুমুস (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ সরকারী ট্রেজারীতে জমা দেয়া আবশ্যিক) ও পশু সম্পদের আদায়যোগ্য যাকাত।

হক্কুল্লাহর এসব বিভাজন সম্পর্কে ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক সনুরী একটা চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, হক্কুল্লাহর সাধারণ সীমানা ব্যাপক। হক্কুল্লাহর মধ্যে দীন ও

(PUBLIC LAW) গণঅধিকার আইন একাকার হয়ে যায় তদ্রুপ ফৌজদারীও অর্থনৈতিক আইনের মধ্যেও মিশ্রণ ঘটে। (আততালবীহ্ পৃষ্ঠা-৭০৫, মাসাদিরুল হক ফিল ফিকহিল ইসলামী মা'ল মুকারিনাতু বিল ফিকহিল গারবী।) এগুলো হলো উস্তাদ আব্দুর রাজ্জাক সানুরীর বক্তৃতামালার সংকলণ যা তিনি আরব লীগের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান উচ্চতর গবেষণা সংস্থায় দিয়েছিলেন। প্রকাশ ১৯৪৫ পৃষ্ঠা -৪৪।

৫. দেখুন শরহে তাওয়ালিউল আনওয়ার, শরহে আসসুনদী আলা দুররিল মুখতার। খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা ৬২১ ও ৬৩৬। এই কিতাবটি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত। এ কিতাবটিতে দেখা যায় ১৩৯৪ হিজরী সনের যিলকদ মাসে এটার লেখা শেষ হয়েছে। আল ফসুলুল কামসাতা আশারা ফিমা ইউজিবুত তাযির ওয়ামা লা ইউজিবু ওয়া গাইরু যালিকা- আল্লামা আল উসতার দুশনী পৃষ্ঠা-৫। আল আহকামুস সুলতানিয়া আল মাওয়ার্দী পৃষ্ঠা-২২৫। আল আহকামুস সুলতানিয়া আবুয়ালা পৃষ্ঠা-২৬৫। মাসাদিরুল হক ফিল ফিকহিল ইসলামী- ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক সনুরী পৃষ্ঠা-৪৪।

৬. দেখুন হাশিয়া ইবনে আবিদীন খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৯২ আলফুসূলুল খামসা আশারা ফিত তা'যির, আল আসতার দুশনী পৃষ্ঠা-৩, এবং আল আহকামুস সুলতানিয়া আলমাওয়ার্দী পৃষ্ঠা-২২৫।

৭. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৯২, আল আসতার দুশনী ফিততাযির পৃষ্ঠা-৫। শরহে তাওয়ালিউল আনওয়ার শরহে আসসুনদী আলা দুররিল মুখতার খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা-৬৩৬। কাশফুল কিনা আলা মাতানিল আকনা খণ্ড-৬৪ পৃষ্ঠা ৭৪। আলমুগনী ইবনে কুদামা খণ্ড-১০ পৃষ্ঠা-৩৪৮/৩৪৯। আশশারহুল কবীর যা আলমুগনীর সাথে যুক্তভাবে ছাপানো পৃষ্ঠা-৩৬২-৩৬৩।

৮. আল আহকামুস সুলতানিয়া, আলমাওয়ার্দী পৃষ্ঠা-২২৫।

৯. শরহে তাওয়ালিউল আনওয়ার শরহিস সুনদী আলা দুররে মুখতার খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা- ৬৩৬। মাসাদিরুল হক ফিল ফিকহিল ইসলামী, ডক্টর আবদুর রাজ্জাক সানুরী পৃষ্ঠা-৪৫।

১০. কাশফুল কিনা আনমাতানিল ইকনা খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-৭৩ এবং মাসাদিরুল হক ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক সনুরী পৃষ্ঠা-৪৫।

১১. আল ফুসূলুল খামসাতা আশারা ফিমা ইউজিবুত তা'যির ওয়ামা লা ইউজিবু আল আসতার ওয়াশনী পৃষ্ঠা-৪-৫ রাদ্দুল মুখতার আলা দুররিল মুখতার খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৮৬/১৮৭ এবং তুলনা করার জন্যে দেখতে পারেন, মাসাদিরুল হাক্কি ফিল ফিকহিল ইসলামী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক আহমদ সনুরী পৃষ্ঠা-৪৫।

১২. মাসাদিরুল হাক্কি ফিল ফিকহিল ইসলামী, ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক সানুরী পৃষ্ঠা-৪৫ ও এর পর।

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬
বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৫, পৃষ্ঠা : ৭১-৭৫

ইসলামে পানিনীতি ও বিধিমালা

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

দুই.

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে মহানবীর স. ঘোষণা অনুযায়ী পানি চারণভূমি ও তার তৃণ এবং অগ্নি শিখা হচ্ছে সাধারণ সম্পত্তি। এগুলোর উপর সকল মুসলমানের স্বত্ব রয়েছে (কিতাবুল মিযান, পৃষ্ঠা-৩৮৮) এ প্রেক্ষিতে এসব সম্পত্তি উপযোজনের যে কোন প্রচেষ্টা রোধ করার উদ্দেশ্যে তিনি এগুলোর বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন (কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা, ৫৫)। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এর মাধ্যমে রসূল স. পানির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই ব্যবস্থাগুলোই ছিল ইসলামে পানি সংক্রান্ত পরবর্তী ব্যবহারতত্ত্ব ও আইন কানুনের ভিত্তি।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক বছরগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রসূল স. নির্দেশিত এই নীতিমালাসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছিল। এর ফলে এ ধারণা মুসলমানদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে পানির আধার ও সরবরাহের মালিক কোনও ব্যক্তি যদি তৃষ্ণার্ত মুমূর্ষু কোনও ব্যক্তিকে পানি দিতে অস্বীকার করে তাহলে তা হবে একটি মারাত্মক অপরাধ। এ প্রেক্ষিতে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি তার জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজন বোধে পানি সরবরাহে অস্বীকারকারী মালিকের কাছ থেকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তার চাহিদা অনুযায়ী পানি দাবী করতে পারে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা. এর আমলে পানি দিতে অস্বীকার করার কারণে তৃষিত ব্যক্তির মৃত্যু হলে দায়ী ব্যক্তিকে তার জন্য রক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হতো। সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত এই নীতিমালাসমূহকে ভিত্তি করে ইসলামের পানি আইন ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু কাল পরিক্রমায় ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপ্তি ও অনারব এলাকা বিজয়ের আলোকে জটিল সামাজিক ও স্থানীয় চাহিদাসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এ প্রেক্ষিতে রসূল স. নির্ধারিত নীতিসূত্র অক্ষুণ্ন রেখে জরুরী অবস্থা ও নতুন চাহিদা মোকাবেলার জন্য সময়ে সময়ে পানি আইন ও বিধিমালাকে সংশোধন করা হয় যাতে করে জটিল সংকটও মোকাবেলা করা যায়। এই আইন ও বিধিসমূহ এখনো অনেক মুসলিম দেশে অনুসরণ করা হয়। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এই আইনগুলো বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করবো।

লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

পানির মালিকানা ও ব্যবহার

১. তৃষ্ণা নিবারণের অধিকার : বিচার শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধিকার হচ্ছে কোন ব্যক্তি বা তার গবাদি পশুর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানি প্রাপ্তির অধিকার। এ ব্যাপারে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে রচিত মাযহাবসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপঃ

সুন্নী মতবাদ : এই মতবাদ অনুযায়ী মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানির উপর সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে বিনামূল্যে সর্বত্র পানির ব্যবহারই হচ্ছে সাধারণ নীতি। তবে এই নীতিটির প্রয়োজন ও ব্যবহার পানির উৎসের শ্রেণী বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল এবং জনহিতকর কাজের মধ্যে অনেকটা সীমাবদ্ধ। পানির তিনটি প্রধান উৎস রয়েছে এবং এগুলো হচ্ছে ঃ

১. বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পানির আধার ঃ নদী-নালা, সমুদ্র ,হ্রদ, পাহাড়ের বরফ গলা পানি এর অন্ত র্ভুক্ত এবং এই পানির উপর অবাধে তৃষ্ণা নিবারণের অধিকার প্রয়োগ করা যায়। ইচ্ছা করলে যে কোন মানুষ যে কোন সময়ে বিনা বাধায় এই আধারের পানি নিজে পান করতে পারেন, পশুকে খাওয়াতে পারেন এবং উভয়ের গোসলের কাজে ব্যবহারও করতে পারেন (বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা-১০৪)। এই অধিকার অনুযায়ী পানির উৎসে যাবার উদ্দেশ্যে যদি কারোর সম্পত্তি বা রাস্তা ব্যবহার করতে হয় তাহলে চলাচলের জন্য তার উপর ফিস বা খাজনা আরোপ করা যাবে না।

২. উপযোজিত পানি ঃ ক) সামাজিক মালিকানাধীন পানি, যেমন সেচ ও নিষ্কাশন খাল এর অন্ত র্ভুক্ত। এক্ষেত্রেও তৃষ্ণা নিবারণের অধিকার সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। তবে কারোর গৃহপালিত পশু যদি খালের বা দীঘির পাড় ক্ষতিগ্রস্ত করে তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন জলাশয়ের বেলায় সামাজিক অধিকার প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপ্যারে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত বিভিন্ন। হানাফী মাযহাবের মতে এক্ষেত্রেও জরুরী প্রয়োজনে তৃষ্ণা নিবারণের অধিকার প্রযোজ্য। অন্যথায় তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্য বল প্রয়োগ হালাল হয়ে পড়তে পারে। তবে অতিরিক্ত পানি থাকলেই কেবল এ অধিকার প্রযোজ্য হতে পারে। মালেকী মাযহাবও তৃষ্ণার অধিকারকে স্বীকার করে তবে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির যদি আর্থিক সঙ্গতি থাকে তাহলে তার জন্য মূল্য পরিশোধ করা জরুরী। শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী ব্যক্তি মালিকানাধীন পানির উপর অগ্রাধিকার প্রযোজ্য হয়।

৩. অন্যান্য উৎসের পানি ঃ এসব জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে পাতকুয়া, পুকুর, দীঘি প্রভৃতি যা বেসরকারী মালিকানধীন নয় এমন জমিতে খনন করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের চাহিদা এবং প্রদত্ত শ্রমকে বিবেচনা করে এই পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক) জনস্বার্থে খননকৃত কূপ ও জলাশয় ঃ এই পানি সকলের জন্য উন্মুক্ত; তবে সরবরাহে দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিলে মানুষের চাহিদা পূরণের পরই পশুর চাহিদা পূরণ করা যাবে।

খ) বেদুঈনদের দ্বারা খননকৃত কূপ ঃ তাদের অবস্থানকালীন পরিপূর্ণ সময়ের জন্য এই পানির উপর বেদুঈনদের একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে। তবে পর্যাপ্ত পানি থাকলে তারা তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে পানি দিতে অস্বীকার করতে পারে না। তারা চলে যাবার পর এই কূপ সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং 'আগে আসলে আগে পাবেন' এই নীতির ভিত্তিতে তার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করা হয়। তিন নং ক্যাটাগরিতে উল্লেখিত পানির বেলায় ইসলামী আইন পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অগ্রাধিকার নির্ণয় করেছে ঃ

১। পানির অভাবে সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি।

২। কূপ খননকারী ব্যক্তি।

৩। মুসাফির। তিনি পানি তোলার জন্য কুয়ার মালিকের কাছ থেকে বালতি, রশি প্রভৃতি দাবী করতে পারেন।

৪। স্থানীয় বাসিন্দা।

৫। কূপ খননকারীর গবাদি পশু।

৬। মুসাফিরের সওয়ারী বা অন্যান্য পশু।

৭। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দাদের পশু।

শিয়া মতবাদ

এই মতবাদ অনুযায়ী সরকারি মালিকানাভুক্ত জলাধারের বেলাতেই শুধু মাত্র তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণের অধিকার প্রযোজ্য বেসরকারী মালিকানাভুক্ত জলাশয়ের উপর শুধু মাত্র মালিকের অধিকার বর্তায় এবং অন্য কোনো লোক এ ধরনের জলাধার বা জলাশয়ের পানি ব্যবহার করতে চাইলে তাকে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

সেচের অধিকার

জমি, ফসল এবং গাছ-পালায় পানি দেবার অধিকার হচ্ছে সেচের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

সুন্নী মতবাদ

১। সামাজিক অধিকার ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নদীসহ বৃহত্তর জলাশয়সমূহের উপর পানি সেচের সামাজিক অধিকার প্রযোজ্য। তবে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

ক) হ্রদের পানি ঃ কোনও প্রকার বিধি-নিষেধ ছাড়াই সেচের জন্য এই পানি ব্যবহার করা যাবে।

খ) সর্বসাধারণের জন্য ক্ষতিকর না হলে নদীর পানিও ব্যবহারযোগ্য যা সেচের উপযোগী।

গ) বৃষ্টির পানি ঃ লাওয়ারিশ জমির উপর পতিত ও জমাকৃত বৃষ্টির পানি যে কোন লোক সেচের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সন্নিহিত আবাদী জমির মালিক ১ নম্বর অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। তবে এ ধরনের প্লটের মালিক যদি একাধিক থাকেন তাহলে এই অগ্রাধিকারের

বিষয়টি পুনর্বিবেচনা যোগ্য। যার ফসলে পানির চাহিদা সবচেয়ে বেশি তিনিই সর্ব প্রথম এই পানি ব্যবহার করবেন।

ব্যক্তিগত অধিকার : এই ক্ষেত্রে সেচের পানি ব্যবহারের ব্যাপারে ব্যক্তির সাধারণ অধিকার উপযোজনের উপর নির্ভরশীল। এই উপযোজন নদী ও খাল ভেদে বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

ক. নির্ধারিত স্তর ও মাত্রায় পানি জমা করে রাখার জন্য খননকৃত ছোট নদী

এই ক্ষেত্রে পানি সেচের অধিকার সাধারণ নীতিমালার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু শর্ত এই যে সংরক্ষিত পানির পরিমাণ কমপক্ষে পায়ের গোছা পরিমাণ হবে। তবে পানি যদি দুস্প্রাপ্য হয় তখনি শুধু এই বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হবে অন্যথায় যে কেউ সেচের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পানি ব্যবহার করতে পারবে। উজানের কৃষক ভাটির কৃষকের জন্য কি পারিমাণ পানি ছাড়বে সে সম্পর্কে মতামতের কিছুটা বিভিন্নতা রয়েছে। শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী শুধুমাত্র অতিরিক্ত পানিই উজানের কৃষক ছাড়বেন। মালেকী মাযহাব মতে, উজানের কৃষক তার প্রয়োজন পূরণের পর কোন পানিই ধরে রাখবেন না, ভাটির কৃষকের ব্যবহারের জন্য তাকে অবশ্যই সব পানিই ছেড়ে দিতে হবে। এটা করতে গিয়ে যদি ভাটির জমি প্লাবিত হয় এবং ফসল নষ্ট হয় তাহলে উজানের কৃষক তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবেন না, অবশ্য এটা যদি প্রমাণিত হয় যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ফসলের ক্ষতির উদ্দেশ্যে তা করেছেন তাহলে ক্ষতিপূরণ দেয়া থেকে তিনি রেহাই পেতে পারেন না।

খ. সেচ নালা

সেচ নালাসমূহ যারা তৈরি করেন যৌথভাবে তারাই হচ্ছেন এর মালিক এবং তারা এককভাবে এ থেকে পানি সেচের অধিকার ভোগ করেন। সেচ ছাড়া অন্য কোন নির্মাণ কাজ যেমন কল কারখানা বা পুল কালভার্ট তৈরির কাজে পানি ব্যবহার করতে হলে অপরাপর অংশীদারদের সম্মতির প্রয়োজন হবে।

সকল সুবিধাভোগী সশরীরে কিংবা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে একত্র হয়ে সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পানির ব্যবহারবিধি নির্ণয় করবেন। নিম্নের দৃষ্টান্ত গুলো থেকে পানির বিভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

* বিবর বা গর্ত বিশিষ্ট তক্তা বা আর সি সি দেয়াল দিয়ে বাঁধ নির্মাণ। প্রত্যেক ব্যবহারকারীর পানি প্রাপ্তির অধিকারের উপর গর্তের সাইজ নির্ভর করবে। এই গর্তের ভিতর পাইপ ঢুকিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী তার জমিতে পানি নিয়ে যাবেন।

* পর্যাক্রমে জমিতে পানি দেয়া। পানি সরবরাহের পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে এই রোটেশান দৈনিক সাপ্তাহিক অথবা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোন ভিত্তিতে হতে পারে।

সময়ের পরিমাপের জন্য মালেকী মাযহাব Hour glan ব্যবহার করেন। পানির গতি প্রবাহের বিভিন্নতা বিবেচনার জন্য এতে ব্যবস্থা রাখা হয়।

পানি সরবরাহের বেলায়ও মালিক এবং ব্যবহারকারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য তাদেরকে নালার ধারে নল বসানোর ব্যবস্থা করতে হয়। চাহিদা ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্মতি নিয়ে নলের আকার বা সাইজ নির্ণয় করতে হয়।

গ. কূয়া : নিজের জমিতে হোক কিংবা মালিকবিহীন খালি জমি, খনন কাজসম্পন্ন হবার পর কূয়া খননকারী ব্যক্তি কূয়ার মালিক বলে গণ্য হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী কূয়ার মালিকই এককভাবে এর সুবিধাভোগী এবং সেচের জন্য তিনি অন্য কাউকে পানি দিতে বাধ্য নন। ব্যবহারের মাধ্যমে দখলীস্বত্ব প্রাপ্তির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতাদর্শগত মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রতিবেশীর চাহিদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার সাথে সদাচরণের ব্যাপারে ইসলামের সাধারণ নির্দেশ ছাড়াও সেচের অধিকারের ক্ষেত্রে মাযহাবগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

হানাফী মাযহাব মতে এ ব্যাপারে পানির মালিকের উপর কোনও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় না। শাফেয়ীরা বিশ্বাস করেন যে, প্রতিবেশীদের জমিতে সেচ দেয়ার জন্য অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দেয়া বাধ্যতামূলক। পক্ষান্তরে মালেকী মাযহাব মতে কূয়ার মালিককে উপযুক্ত মূল্য দিয়েই শুধু কূয়ার অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা যাবে। (চলবে)

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬
বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৫, পৃষ্ঠা : ৭৬-১০১

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ

ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর

আমাদের সমাজের সকল মানুষ এবং ইসলাম সম্পর্কে যাদের সামান্য জ্ঞানও আছে তারা সকলেই জানেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র নির্বিশেষ সমাজের সকল মানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম প্রেরণা। তাত্ত্বিক, প্রায়োগিক ও ঐতিহাসিকভাবে তা সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সকল মানুষই ধর্মীয়ভাবে শান্তিপ্রিয়। সবাই আমরা শান্তি চাই। এখন সমস্যা হলো, তাহলে ইসলামের নামে বোমাবাজি, অশান্তি, নিরীহ নিরপরাধ মানুষ হত্যা, আত্মহত্যা ইত্যাদি কেন ঘটছে? এ সকল ঘটনার কারণ জানা শুধু কৌতূহল নিবারণের বিষয় নয়, বরং সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। সন্ত্রাস একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধি। এর নিরাময়ের জন্য এর সঠিক কারণ নির্ণয়ে বিভ্রান্তি সমস্যাকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলতে পারে।

ইসলামের নামে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্বে অমুসলিম ও মুসলিম গবেষক-বুদ্ধিজীবীগণ জঙ্গিবাদের যে সকল কারণ উল্লেখ করছেন সেগুলোর অন্যতম হলো: ১. ইসলাম, ২. ইসলামী শিক্ষা, ৩. ওহাবী মতবাদ ও ৪. পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র।

আলোচিত প্রথম কারণ : ইসলাম

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে দায়ী করেন। তাদের মতে 'ইসলাম তার অনুসারীদের অসহিষ্ণুতা ও জঙ্গিবাদ শিক্ষা দেয়। ইসলামে জিহাদের নামে অমুসলিমদেরকে হত্যা করার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এর ফলেই মুসলিমদের মধ্যে জঙ্গিবাদের উত্থান।' তাদের মতে 'ইসলামী সন্ত্রাস' ও 'জঙ্গিবাদ' বন্ধ করার একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্মকে নির্মূল অথবা নিয়ন্ত্রণ করা।' এরা দাবী করেন, ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের উত্থান 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের সঠিকত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক আল-হাদীস বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।

এক্ষেত্রে মানব সভ্যতার সংরক্ষণের জন্য এই জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় হলো, শক্তির মাধ্যমে এদেরকে হত্যা করা, বন্দী করা ও মুসলিম দেশগুলোকে সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পঙ্গু করা। বিশেষত ইসলামী শিক্ষার বিস্তার রোধ করা। এ সকল গবেষক পণ্ডিতদেরকে হয়ত মুসলিমগণ 'ইসলাম-বিদ্বেষী' বলে মনে করতে পারেন, তবে এদের অনেকের ক্ষেত্রেই এরূপ মতপ্রকাশের জন্য বিদ্বেষের চেয়ে অজ্ঞতাই বড় কারণ। এদের অনেকেই ইসলামের জিহাদ বিষয়ক কিছু নির্দেশ হয়ত পাঠ করেছেন, কিন্তু জিহাদের প্রকৃত অর্থ, শর্ত বা বিধানাবলি জানেন না। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম ধর্ম-প্রচারক বা ধর্মগুরুদের প্রচারণামূলক বইপুস্তকই পাঠ করেছেন, ইসলামী জ্ঞানের সূত্রগুলো থেকে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করেননি। এরা দেখছেন কোনো কোনো মুসলিম নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করছে এবং এজন্য তারা ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের উদ্ধৃতি পেশ করছে। কাজেই তাঁরা ধারণা করেন কুরআন এরূপই শিক্ষা দিয়ে থাকে। এভাবেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই জঙ্গিবাদের জন্য ইসলামই দায়ী এবং ইসলামকে নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণ করাই এই সমস্যা দূরীকরণের একমাত্র উপায়।

পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত, যারা বিভিন্ন মুসলিম সমাজ ও জনগোষ্ঠীর সাথে সুপরিচিত বা ইসলাম ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা পরিচিত, তারা উপর্যুক্ত মতামত পুরোপরি সমর্থন করেন না। তারা মনে করেন, ইসলামে অনেক ভাল কথা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহাবস্থান সম্ভব। তবে ইসলামের মধ্যে ভাল বিষয়ের সাথে জিহাদ, ধর্মত্যাগী, বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ক কিছু উগ্র ও অসহিষ্ণু বিষয়ও শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যেগুলো মানবাধিকার বা সভ্যতার সহাবস্থান বা বিকাশের বিপক্ষে। এ সকল শিক্ষা থেকেই জঙ্গিবাদের জন্ম। এজন্য জঙ্গিবাদ দমনের জন্য ইসলামের 'ভাল শিক্ষাগুলোর' প্রশংসা করতে হবে এবং সেগুলোর বিকাশ ঘটাতে হবে। পাশাপাশি উগ্র বা 'খারাপ' শিক্ষার বিস্তার রোধ করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এ থেকে 'উগ্রতা'-কে উৎসাহ দিতে পারে এরূপ শিক্ষা বাদ দিতে হবে। এভাবে মুসলিম সমাজগুলোতে 'মডারেট' মুসলিমদের উত্থান ঘটাতে পারলেই জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

আলোচিত দ্বিতীয় কারণ : ইসলামী শিক্ষা

বিশ্বের ধার্মিক বা অধার্মিক কোনো মুসলিমই উপর্যুক্ত মতামতদ্বয় সঠিক বলে মানতে পারেন না। বরং তারা একে বাস্তবতা বিবর্জিত এবং বিদ্বেষমূলক মত বলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা অনুভব করেন যদি ইসলাম ধর্মই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী হতো তাহলে আমরা সকল মুসলিমই আমাদের মধ্যে জঙ্গিবাদের আগ্রহ বা প্রেরণা অনুভব করতাম। মুসলিম পরিবারে বা সমাজে লালিত পালিত সকল ধার্মিক বা অধার্মিক মুসলিমই ইসলাম সম্পর্কে কমবেশি কিছু শিক্ষা পরিবার, প্রতিষ্ঠান বা সমাজ থেকে পেয়েছেন। কিন্তু কখনোই তারা অমুসলিম বা অন্যান্য মতাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণুতার শিক্ষা পাননি। সকল মুসলিম সমাজেই মুসলিমগণ অমুসলিমদের সাথে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির

সাথে বসবাস করে আসছেন। কাজেই জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম কখনো দায়ী হতে পারে না। সমস্যা অন্যখানে, ইসলামের মধ্যে নয়। তাঁরা অস্বীকার করেন না কিছু মুসলিম সন্ত্রাসের সাথে জড়িত। তবে তারা কখনোই স্বীকার করেন না তাদের ধর্ম তাদের সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। বরং এ সকল সন্ত্রাসীদের ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি, মানসিক বিক্ষুব্ধতা, সামাজিক অনাচার বা অন্য কোনো কারণ এর পিছনে কার্যকর।

এদের অনেকেই মনে করেন জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য মূলত দায়ী ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার। জঙ্গিবাদের বিস্তারে মাদ্রাসা শিক্ষার এই দায়িত্বের প্রকৃতি নির্ণয়ে এ সকল পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অমুসলিম পণ্ডিতগণও 'ইসলামী শিক্ষাকেই' মূলত জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য দায়ী করছেন। তবে 'দায়িত্বের' প্রকৃতি নির্ণয়ে তাদের মধ্যে এবং তাদের সাথে সেকুলার মুসলিম পণ্ডিতদের ভিন্নতা রয়েছে। কেউ মনে করছেন যেহেতু ইসলামের মধ্যেই জঙ্গিবাদের শিক্ষা রয়েছে, সেহেতু ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রসার মানেই জঙ্গিবাদের প্রসার। যত বেশি কুরআন, হাদীস, ফিক্হ ইত্যাদি ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা প্রসার লাভ করবে, তত বেশি 'জিহাদী' মনোভাব, অন্য ধর্ম ও অন্য মতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব ও মোল্লাতান্ত্রিক (theocraric) স্বৈরাচারী সরকার জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাব প্রসার লাভ করবে। এজন্য ইসলামী শিক্ষা বা ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রসার রোধই জঙ্গিবাদ দমনের প্রধান উপায়।

অন্য অনেকে মনে করেন যে, ইসলামের মধ্যে মূলত জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই, তবে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাগুলোতে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথবা এগুলোর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি ইসলামকে জঙ্গিবাদী রূপদানের সহায়ক। অথবা ইসলামী আবেগের অপব্যবহার করে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদেরকে সহজেই জঙ্গিতে রূপান্তরিত করা যায়। কেউ মনে করছেন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবেই ইসলামের শিক্ষা প্রদান করছে, তবে সম্ভবত শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু ত্রুটি রয়েছে, যে কারণে এগুলো জঙ্গিবাদের সাথে জড়িয়ে পড়ে। এদের মতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারই জঙ্গিবাদ রোধের উপায়। `It is a fact that some of the Madrasha students have got involved with what is called `Islamic' militancy....Though Madrasha education may not be held responsible for these most unwanted activities, yet there are some loopholes and it is time to think about bringing Madrasha education into the mainstream.'[১]

'ইসলামী জঙ্গিবাদের' জন্য 'ইসলাম'কে দায়ী করলে যেমন মুসলিমগণ হতবাক, বিস্মিত, ব্যথিত বা উত্তেজিত হয়ে এরূপ মতকে বিদ্বেষমূলক বলে মনে করেন, ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসার সাথে জড়িত মানুষরাও এই দ্বিতীয় মতটির বিষয়ে একইরূপ বিস্ময়, ব্যথা বা উত্তেজনা অনুভব করেন। তাঁরা অনুভব করেন, যদি ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষাই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী হতো তাহলে

আমরা মাদ্রাসার সকল ছাত্র শিক্ষক আমাদের মধ্যে জঙ্গিবাদের আগ্রহ বা প্রেরণা অনুভব করতাম। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কখনোই তা নয়। সন্ত্রাস, হত্যা ও ধ্বংসের প্রতি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ও বিরোধিতা প্রদর্শন করছেন এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা আলেম, ইমাম ও পীর-মাশাইখ। বিগত প্রায় আড়াই'শ বছর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা উপমহাদেশে চালু রয়েছে এবং মূলত একই পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে চলেছে। এছাড়া অনুরূপ পদ্ধতির অগণিত মাদ্রাসা মালয়েশিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশেও চালু রয়েছে। এগুলো থেকে বের হয়ে আসা অগণিত মানুষ সমাজের বিভিন্ন স্তরে কাজ করেছেন, কিন্তু ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই তাঁরা সন্ত্রাসের জন্ম দেননি। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে, কিছু মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক এই অপরাধের সাথে জড়িত; তবে তারা কখনোই বিশ্বাস করেন না যে, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের এই অপরাধের জন্য দায়ী। বরং তা তাদের ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি।

এ সকল মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষেরা উপর্যুক্ত পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীদেরকে 'ইসলামী শিক্ষা বিদ্বেষী' বা 'মাদ্রাসা বিদ্বেষী' বলে মনে করে থাকেন। তবে আমার কাছে মনে হয় 'ইসলামী জঙ্গিবাদের' জন্য 'ইসলাম ধর্ম-কে দায়ী করা এবং 'ইসলামী শিক্ষা'-কে দায়ী করার পিছনে মূলত অজ্ঞতা কার্যকর। পাশ্চাত্য অমুসলিম পণ্ডিতগণ যেমন কোনো কোনো মুসলিমকে সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত হতে দেখে ইসলামকে সন্ত্রাসীদের ধর্ম বলে দায়ী করছেন, তেমনি অনেক সেকুলার মুসলমানও কোনো কোনো মাদ্রাসা শিক্ষিতকে সন্ত্রাসে লিপ্ত দেখে শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করছেন। এ সকল পণ্ডিতের অনেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি এবং মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে পরিচিত নন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে তাঁরা জানতে পারেন মাদ্রাসাগুলো জঙ্গিবাদীদের আখড়া এবং মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকগণ জঙ্গি কার্যক্রমে লিপ্ত। এথেকে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষাই মূলত জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিস্তারের জন্য দায়ী।

সাধারণভাবে আমরা বুঝতে পারি কোনো অপরাধীর অপরাধের জন্য তার ধর্ম, শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার ইত্যাদি সাধারণত দায়ী হয় না। তদুপরি আমি এখানে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করার জন্য পাঠককে অনুরোধ করছি।

১. আমাদের সমাজের লক্ষ লক্ষ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক সকলেই আমাদের দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিভিন্ন সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত। এদের দুর্নীতির জন্য কেউই তাদের শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করেন না। কারণ তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করেন তারাও একই শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বা এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কখনোই দুর্নীতি শিক্ষা দেয়া হয় না, বরং সততা ও আদর্শই শিক্ষা দেয়া হয়। কাজেই দুর্নীতিবাজের দুর্নীতির জন্য তার ব্যক্তিগত লোভ, সামাজিক অনাচার, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ইত্যাদিই দায়ী; তার ধর্ম, শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। এজন্য কেউ দুর্নীতি

প্রসারের জন্য 'আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা' বা 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' দায়ী বলে মন্তব্য করলে বা ডাক্তারদের 'কসাইসুলভ আচরণের জন্য' মেডিকেল কলেজগুলো' দায়ী বলে মন্তব্য করলে শিক্ষিত মানুষেরা তাকে নির্বোধ বলেই মনে করবেন।

২. অনুরূপভাবে আমাদের দেশের অনেক মানুষই সমাজতন্ত্র বা 'সর্বহারার রাজত্বের' নামে সন্ত্রাসকর্মে লিপ্ত। এরা আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা লাভ করেছেন। কিন্তু কেউই বলবেন না যে, এদের ঘৃণ্য কর্মের জন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দায়ী।

৩. স্বাধীনতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমানে আমেরিকার প্রশাসন ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান জীবন ও সম্পদ হারিয়েছেন। তারা নির্বিচারে বোমা মেরে বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের 'গণহত্যাযজ্ঞে' লিপ্ত হয়েছেন এবং সম্পদ ধ্বংস করছেন। তারপরও কয়েকশত কুর্দীকে হত্যার অপরাধে তারা সাদ্দাম হোসেনের বিচার করছেন। ইরাক, আরব ও মুসলিম বিশ্বের যে কোনো দেশ ও ধর্মের শান্তিকামী মানুষের দৃষ্টিতে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মানবতার বিরুদ্ধে কঠিনতম অপরাধ। এখানে একজন বিক্ষুদ্ধ ইরাকী, আরব বা মুসলমান এই অপরাধের জন্য 'খৃস্টধর্ম', 'গণতন্ত্র' বা 'আমেরিকান সভ্যতা'-কে দায়ী করে মন্তব্য করতে পারেন; কারণ প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার সহকর্মীবৃন্দ 'বিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণ খৃস্টান, আমেরিকান সভ্যতার সন্তান ও গণতন্ত্রের ধারক-বাহক। কিন্তু কোনো খৃস্টান, আমেরিকান, গণতন্ত্র প্রেমিক বা কোনো একজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত এই মতের সাথে একমত হবেন না। তারা একে অজ্ঞতা প্রসূত প্রলাপ বলেই মনে করবেন। কারণ তারা জানেন যে, খৃস্টধর্ম, গণতন্ত্র বা আমেরিকান সভ্যতা কোনোটিই এরূপ হত্যাযজ্ঞ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও লুটতরাজ শিক্ষা দেয় না বা সমর্থন করে না। মার্কিন প্রশাসন যা করছেন তা বর্তমান নেতৃবৃন্দের অন্যায়, এর জন্য তাদের ধর্ম আদর্শ বা সভ্যতা দায়ী নয়।

৪. ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়টিও একই পর্যায়ভুক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করা মানুষদের দুর্নীতি বা সন্ত্রাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়ী করলে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৎ ও নীতিবান ছাত্রদের কাছে তা পাগলামি বলে মনে হয়, তেমনিভাবে মাদ্রাসা শিক্ষিত কতিপয় মানুষের সন্ত্রাসের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করলেও মাদ্রসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত সাধারণ মানুষদের কাছে তা পাগলামি বলেই মনে হয়।

৫. বর্তমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সম্পৃক্তির মূল বিষয়টিও বিবেচ্য। আমরা দেখেছি যে, সহিংসতা বা সন্ত্রাসে লিপ্ত ব্যক্তি নিজের ধর্ম বা আদর্শকে ব্যবহার করেন। দেশপ্রেম ও গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে মানুষের গণতান্ত্রিক অনুভূতিও মানবাধিকারের প্রতি ভালবাসাকে ব্যবহার (exploit) করা হয়। এভাবেই আমেরিকার গণতন্ত্রপ্রেমিক ও মানবাধিকারবাদী মানুষেরা প্রেসিডেন্ট বুশকে ম্যান্ডেট দিয়েছেন আত্মরক্ষা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইরাকের নিরীহ নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালানোর।

স্বভাবতই ইসলামের নামে সন্ত্রাসে ইসলামী অনুভূতিকে ব্যবহার (exploit) করা হয়েছে ও হচ্ছে। এতে কোনো কোনো ইসলাম প্রেমিক সরল মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন। মাদ্রাসায় পড়া কোনো মানুষ এরূপ প্রতারণার শিকার হতে পারেন না এরূপ দাবী কেউই করেন না। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসে যেমন গণতন্ত্র প্রেমিকরা প্রতারিত হচ্ছেন, তেমনি ইসলামের নামে সন্ত্রাসে ইসলাম প্রেমিক মাদ্রাসা ছাত্ররা বেশি প্রতারিত হবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত। জঙ্গিরা হয়ত তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিজেরা কোনো 'মাদ্রাসা' বা 'মসজিদ' প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলো বা মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষেরা দলে দলে এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যোগদান করেছেন। 'ইসলামী সন্ত্রাস' নামক এই জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত মাদ্রাসা শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম।

সংবাদ মাধ্যমের সংবাদ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়। এরূপ সংবাদ, গণমাধ্যমীয় গবেষণা-প্রবন্ধ ও পর্যালোচনার উপর নির্ভর করে আমেরিকার জনগণ নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল যে, সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র (weapon of mass destruction) রয়েছে, যা আমেরিকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি। আর এজন্যই তারা একবাক্যে প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাক যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন। আজ লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানের রক্ত ঝরানো এবং অমূল্য মানবীয় সম্পদের ধ্বংসলীলার পরে সবাই জানতে পারলেন ও স্বীকার করলেন যে, এরূপ কোনো অস্ত্র কোনোকালেই সেখানে ছিল না।

সংবাদ মাধ্যমের কারণেই এখনো সবাই জানলেন না যে, এরূপ অস্ত্র থাকলেও কোনো দিনই ইরাক আমেরিকার স্বাধীনতা বা নিরাপত্তার হুমকি হতে পারত না। শুধু ইসরাঈল রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই গণহত্যা। সংবাদ মাধ্যমের কারণেই এশিয়ার সুনামি মহাসংবাদে পরিণত হয়, কিন্তু ফালুজার গণহত্যা ও মহাধ্বংস কোনো সংবাদই হয় না।

এজন্য গণমাধ্যমের সংবাদ বা তথ্যের উপর নির্ভর করা তো দূরের কথা, প্রশিক্ষিত 'ইন্টেলিজেন্সী'র রিপোর্টের উপর নির্ভর করাও বর্তমানে কঠিন। এ সকল তথ্যের বাইরে বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের দেশের আনাচে কানাচে অগণিত মাদ্রাসা ছড়িয়ে রয়েছে, এ সকল মাদ্রাসার কর্মকাণ্ড সবকিছুই সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এগুলোর ছাত্র শিক্ষক সকলেই সমাজের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। গভীর পর্যবেক্ষণ করেও এদের মধ্যে কোনো সন্ত্রাসীর অস্তিত্ব পায়নি আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী। মাদ্রাসা শিক্ষিত যে সকল মানুষ জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত হয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে তাদের আনুপাতিক হার স্কুল-শিক্ষিত মানুষদের চেয়ে বেশি নয়।

৬. এখানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, সমস্যার কারণ নির্ধারণে বিভ্রান্তি অনেক সময় সমস্যা উস্কে দিতে পারে। সন্ত্রাসের জন্য সন্ত্রাসীর জাতি, ধর্ম, গোত্র, দল বা শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করলে মূলত সন্ত্রাসীকে সাহায্য করা হয়। এতে একদিকে সন্ত্রাসীর স্বজাতি, স্বধর্ম, স্বদল বা স্বশিক্ষার

মানুষেরা সন্ত্রাসের বিরোধিতার পরিবর্তে সন্ত্রাস বিরোধীদের সাথে বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়েন, অপরদিকে পরোক্ষভাবে তাদের মধ্যে সন্ত্রাসীর প্রতি এক প্রকারের 'সহমর্মিতা' জন্মলাভ করে। আমরা দেখেছি যে, কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত সন্ত্রাসের জন্য ইসলামকে দায়ী বলে মন্তব্য করে ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতকেই উস্কে দিচ্ছেন। সন্ত্রাসের জন্য ইসলামী শিক্ষাকে দায়ী করলেও একইভাবে সন্ত্রাসকে উস্কে দেয়া হবে এবং সন্ত্রাসীদের জন্য সহমর্মিতা সৃষ্টি করা হবে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষেরা সন্ত্রাস বিরোধিতার বদলে অপ্রাসঙ্গিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন।

সর্বোপরি এরূপ মতামতের ভিত্তিতে যদি সরকার বা প্রশাসন মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ, সংকোচন বা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ঢালাও কোনো দমন কর্মকাণ্ড হাতে নেন তবে তাতে নতুন এক প্রকারের সহিংসতায় আক্রান্ত হবে দেশ ও জাতি।

মূলত কোনো ধর্ম, মতবাদ বা আদর্শ সহিংসতা বা সন্ত্রাস শিক্ষা দেয় না। মানুষ মানবীয় লোভ, দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, প্রতিশোধস্পৃহা ইত্যাদির কারণে সহিংসতা বা হিংস্রতায় লিপ্ত হয়। এরূপ সহিংসতায় লিপ্ত ব্যক্তি নিজের কর্মের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য, নিজের বিবেককে অপরাধবোধ থেকে মুক্ত করার জন্য, অন্যকে নিজের পক্ষে টানার জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে নিজের আদর্শকে ব্যবহার করে।

এভাবে হাজার হাজার বছর ধরে বসবাসকারী আরবদেরকে পূর্ব জেরুসালেম ও অন্যান্য ফিলিস্তিনী এলাকা থেকে সন্ত্রাস, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে বিতাড়ন করে অন্যান্য দেশে হাজার বছর ধরে বসবাসকারী ইহুদীদেরকে সেখানে নিয়ে এসে ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য ইহুদী-খৃস্টানগণ পবিত্র বাইবেলের বাণীকে ব্যবহার করেছেন। অনুরূপভাবে আইরিশ ক্যাথলিক ব্রিটিশগণ প্রটেস্ট্যান্টের বিরুদ্ধে নিজেদের ধর্মমতকে ব্যবহার করেন, তিব্বতীয় বৌদ্ধ গণচীনের বিরুদ্ধে নিজের বৌদ্ধ ধর্মমতকে ব্যবহার করেন, নিম্নবর্ণের হিন্দু উচ্চবর্ণের হিন্দুর বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বা ধর্মীয় মতামত ব্যবহার করেন, ফিলিস্তিনী যোদ্ধারা ইহুদী দখলদারদের বিরুদ্ধে নিজের ইসলাম ধর্ম থেকে উদ্দীপনা বা প্রেরণা লাভের চেষ্টা করেন।

আমাদের সমাজে 'আওয়ামী লীগের' কর্মী যদি কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে সহিংসতায় লিপ্ত হন তখন তিনি 'স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ইত্যাদি বিষয়কে তার কর্মের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে 'বিএনপি'র কর্মী বা সমর্থক এই ক্ষেত্রে 'শহীদ জিয়া, জাতীয়তা, স্বাধীনতা' ইত্যাদি মহান বিষয়কে নিজের 'এক্সকিউজ' হিসেবে ব্যবহার করেন। উভয় ক্ষেত্রেই দলের অন্যান্য বিচক্ষণ কর্মীরা জানেন নিজেদের সহিংসতা বৈধ করার জন্যই এগুলো বলা হচ্ছে। সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করে মাদ্রাসা শিক্ষা, মাদ্রাসা বা মাদ্রাসা শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিলে স্বভাবতই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে সহিংসতায় লিপ্ত হবেন এবং 'ইসলামী শিক্ষা'-র বিপন্নতাকে অজুহাত হিসেবে পেশ করবেন। এতে একমাত্র সন্ত্রাসীরাই লাভবান হবে এবং জাতি ভয়ঙ্কর সংঘাতের মধ্যে নিপতিত হবে।

আলোচিত তৃতীয় কারণ : ওহাবী মতবাদ

'ওহাবী মতবাদ'-কে জঙ্গিবাদের কারণ হিসেবে অনেক গবেষক উল্লেখ করছেন। বর্তমান সৌদি আরবের ধর্মীয় নেতা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (১৭০৩-১৭৯২ খৃ) প্রচারিত মতবাদকে 'ওহাবী' মতবাদ বলা হয়। তিনি তৎকালীন আরবে প্রচলিত কবর পূজা, কবরে সাজদা করা, কবরে বা গাছে সুতা বেঁধে রাখা, মানত করা ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কার, শিরক, বিদ'আত ইত্যাদির প্রতিবাদ করেন। তাঁর বক্তব্য শুধু প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উপরন্তু তাঁর বিরোধীদের তিনি মুশরিক বলে অভিহিত করতেন। ১৭৪৫ খৃস্টাব্দে বর্তমান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের অনতিদূরে অবস্থিত দিরইয়্যা নামক ছোট্ট গ্রাম-রাজ্যের শাসক আমীর 'মুহাম্মাদ ইবনু সাউদ' (মৃত্যু ১৭৬৫) তাঁর সাথে যোগ দেন। তাদের অনুসারীগণ তাদের বিরোধীদেরকে মুশরিক বলে গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা শুরু করেন। ১৮০৪ সালের মধ্যেই মক্কা-হিজাযসহ আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ 'সাউদী'-'ওহাবী'দের অধীনে চলে আসে।

তৎকালীন তুর্কী খিলাফত এই নতুন রাজত্বকে তার আধিপত্য ও নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলে মনে করেন। কারণ একদিকে মক্কা-মদীনাসহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্যদিকে মূল আরবে স্বাধীন রাজ্যের উত্থান মুসলিম বিশ্বে তুর্কী খিলাফতের একচ্ছত্র নেতৃত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তুর্কী খলীফা দরবারের আলেমগণের মাধ্যমে ওহাবীদেরকে ধর্মত্যাগী, ধর্মদ্রোহী, কাফের ও ইসলামের অন্যতম শত্রু হিসেবে ফাতওয়া প্রচার করেন। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারাভিযান চালানো হয়, যেন কেউ এই নব্য রাজত্বকে ইসলামী খিলাফতের স্থলাভিষিক্ত মনে না করে। পাশাপাশি তিনি তুর্কী নিয়ন্ত্রণাধীন মিসরের শাসক মুহাম্মাদ আলীকে ওহাবীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। মিসরীয় তুর্কী বাহিনীর অভিযানের মুখে ১৮১৮ সালে সউদী রাজত্বের পতন ঘটে। এরপর সাউদী রাজবংশের উত্তর পুরুষেরা বারংবার নিজেদের রাজত্ব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সর্বশেষ এই বংশের 'আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রাহমান আল-সাউদ' (১৮৭৯-১৯৫৩) ১৯০১ থেকে ১৯২৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বর্তমান 'সৌদি আরব' প্রতিষ্ঠা করেন।

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম বিশ্বের যেখানেই সংস্কারমূলক কোনো দাওয়াত প্রচারিত হয়েছে, তাকেই সৌদি ওহাবীগণ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাবের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত বা 'ওহাবী আন্দোলন' বলে দাবী করেছেন। অপরদিকে তুর্কী প্রচারণায় 'ওহাবী' শব্দটি মুসলিম সমাজে বিপুল অংশে অত্যন্ত ঘৃণ্য শব্দে পরিণত হয়। মুসলিম বিশ্বের অনেক অংশে তাদেরকে অন্যান্য সকল বিভ্রান্ত সম্প্রাদায়ের চেয়েও অধিকতর ঘৃণা করা হয়। এই সুযোগের অপব্যবহার করে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বৃটিশ বিরোধী আলেমদেরকে ওহাবী বলে প্রচার করতেন; যেন সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা না থাকে। এছাড়া মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় একে অপরকে নিন্দা করার জন্য 'ওহাবী' শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের সমসাময়িক ভরতীয় মুসলিম সংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১৭০৩-১৭৬২খৃ)। তাঁর মত- প্রচারের প্রথম দিকে ১৭৩১ খৃস্টাব্দে মক্কায় গমন করেন এবং তিন বছর সেখানে অবস্থান করেন। এরপর দেশে ফিরে তিনি ভারতে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি শাসন ব্যবস্থার প্রতি স্তরে ইসলামী অনুশাসন প্রবর্তনের অভিমত পোষণ করেন। তবে তিনিও কবর পূজা, পীর পূজা, কবরে মানত করা, কবরবাসী বা জীবিত পীর বা ওলীগণের কাছে বিপদমুক্তির সাহায্য চাওয়া ও অন্যান্য শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার, মাযহাবী বাড়াবাড়ি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। এজন্য কেউ কেউ তাঁকেও 'ওহাবী' বলে চিহ্নিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

তবে শাহ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র শাহ আব্দুল আযীযের (১৩৪৬-১৮৩২খৃ) অন্যতম ছাত্র সাইয়েদ আহমদ বেরলবী (১৭৮৬-১৮৩১খৃ) এর বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকরা সর্বপ্রথম 'ওহাবী' নেতা বলে জোরেশোরে প্রপাগাণ্ডা চালায়। তিনি সমগ্র ভারতে মাযার, দরগা, ব্যক্তি পূজা, মৃত মানুষদের নামে মানত, শিন্নি ইত্যাদি বিভিন্ন শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান। এছাড়া তিনি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে শিখ বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮২১ খৃস্টাব্দে তিনি হজ্জে গমন করেন। প্রায় তিন বছর আরবে অবস্থানের পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে তিনি বৃটিশ ভারত থেকে 'হিজরত' করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গমন করে সেখানে 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং নিজে সেই রাষ্ট্রের প্রধান হন। এরপর তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সেখানে একত্রিত হয়ে বৃটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। কয়েকটি যুদ্ধের পরে ১৮৩১ খৃস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তী প্রায় ৩০ বছর সাইয়েদ আহমদ বেরলবীর অনুসারীগণ বৃটিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার বিচ্ছিন্ন জিহাদ ও প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যান।

বৃটিশ সরকার সাইয়েদ আহমদ বেরলবীর আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন বলে অপপ্রচার চালায়। তারা দাবী করে হজ্জ উপলক্ষে আরবে গমন করে সেখানকার ওহাবীদের থেকে দীক্ষা নিয়েই তিনি তার সংস্কার ও জিহাদ আন্দোলন শুরু করেন। অথচ তিনি কেবল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ নয়, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। সাইয়েদ আহমদ বেরলবীর শিষ্যদের থেকে ভারতে বিভিন্ন সংস্কারমুখী ধারার জন্ম নেয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে অনেকে নির্ধারিত মাযহাব অনুসরণ অস্বীকার করে নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে দাবী করেন। এছাড়া তাঁর শিষ্য জৌনপুরের পীর মাওলানা কারামত আলী একটি সংস্কারমুখী ধারার জন্ম দেন। ফুরফুরার পীর মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকীও সাইয়েদ আহমদ বেরলবীর মতানুসারী ও তাঁর প্র-শিষ্য ছিলেন। এছাড়া দেওবন্দের আলেমগণের বিরুদ্ধেও 'ওহাবী' বলে অপপ্রচার চালানো হয়েছে। বিশেষত আহলে হাদীসগণ ও দেওবন্দের আলেমগণই এই উপাধি বেশি লাভ করেছেন। সাইয়েদ আহমদ বেরলবীর অন্যতম শিষ্য ও সমসাময়িক সংস্কারক মীর নেসার আলী ওরফে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) এবং সমকালীন

অন্য সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। এদেরকেও ওহাবী নামে আখ্যায়িত করার এবং এদের আন্দোলন ও প্রতিরোধকেও ওহাবী আন্দোলন বলার প্রচেষ্টা ইংরেজের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে চালানো হয়েছে।

বর্তমান যুগে বিশ্বব্যাপী তথাকথিত 'ইসলামী সন্ত্রাস' বা জঙ্গিবাদের নেতৃত্বে রয়েছেন উসামা বিন লাদেনের মত সৌদি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিত্ব। আরবের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা এদের অর্থায়ন করেন বলে শোনা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত উপমহাদেশে আহলে হাদীস ও দেওবন্দ-পদ্ধতির কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের এর সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা শোনা যায়। এছাড়া এদের মধ্যে কবর-মাযার ইত্যাদির বিরোধিতা দেখা যায়। সর্বোপরি এরা নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য মৌখিক প্রচার ছাড়াও অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছেন। এজন্য অনেক গবেষক মনে করেন যে, ওহাবী মতবাদের প্রসারই বর্তমান জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ।

তবে এখানে লক্ষণীয় যে, উসামা বিন লাদেনের আন্দোলনের গোড়া পত্তন হয় সৌদি-ওহাবী রাষ্ট্রের বিরোধিতার মাধ্যমে। তাঁর অনুসারীগণ সেখানকার রাজতন্ত্র, মার্কিন প্রীতি ও পাশ্চাত্য তোষণ ইত্যাদির বিরোধিতা করেন এবং সৌদি সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম তাঁরা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের বংশধরসহ সকল সৌদি ওহাবী আলেম বিন লাদেনের আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার।

সর্বোপরি, বিভিন্ন দেশের সংস্কারমূলক আন্দোলন বা প্রতিরোধ আন্দোলনকে 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করার কোনো ভিত্তি নেই। বস্তুত মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর আদর্শ প্রাপ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করেছে তুর্কী খিলাফতের উদ্দেশ্যমূলক প্রচার ও বৃটিশ সরকারের অপপ্রচারের কারণে। ওহাবী মতবাদ ও আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে একান্তই একটি আঞ্চলিক বিষয় ছিল। অন্যান্য মুসলিম দেশের সংস্কার-প্রতিরোধ ও ধর্মকেন্দ্রিক সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের মতই ভালমন্দ মেশানো একটি বিষয়। অন্যান্য দেশে মুসলিমগণ তাদের পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুসারে অনুরূপ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। যেহেতু ওহাবীগণ ও অন্যান্য দেশের মুসলিমগণ সকলেই একই সূত্র, অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইসলামী ফিক্হ ও ইসলামের ইতিহাস থেকে নিজেদের মতামত সংগ্রহ করেছেন, সেহেতু তাদের মতামত ও কর্মের মধ্যে মিল থাকাই স্বাভাবিক। এ জন্য সকল আন্দোলনকে ওহাবী বলার কোনো কারণ নেই।

আমরা জানি আফগানিস্তান ও ইরাকে বিন লাদেনের মতবাদ বা জঙ্গিবাদ প্রসার লাভ করেছে। আর এই দুটি দেশই ঘোর ওহাবী বিরোধী। আফগানিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী হানাফী মাযহাবের কঠোর অনুসারী এবং পীর মাশায়েখদের ভক্ত। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের দীর্ঘ শাসন-আমলে ওহাবী বা অন্য যে কোনো সংস্কারমুখী আলেম ও মতবাদকে কঠোরভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। শুধুমাত্র পীর-মাশায়েখ ও সূফীদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোরতা অবলম্বন করা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই দেশে জঙ্গিবাদের প্রসার থেকে বুঝা যায় যে, জঙ্গিবাদের কারণ অন্য কোথাও নিহিত রয়েছে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, সন্ত্রাসীদের জাতি, ধর্ম গোত্র ইত্যাদিকে ঢালাওভাবে 'সন্ত্রাসের' কারণ বা চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা সঠিক নয়। এতে সন্ত্রাস দমনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, কোনো, জাতি, ধর্ম বা গোত্রের সকল মানুষকে তো আর ঢালাওভাবে বিচার করা যায় না। **জঙ্গিবাদের দায়িত্ব 'ওহাবী মতবাদের' উপর চাপানোর বড় বিপত্তি হলো, এতে সমস্যা সমাধানের পথ হারিয়ে যাবে।** কেননা সৌদি ওহাবীদের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন, কারণ জঙ্গিবাদ তাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। আর অন্য কোনো দেশের কেউ নিজেকে ওহাবী বলে স্বীকার করেন না, যদিও ওয়াহাবীদের সংস্কার নীতির সাথে তাদের অনেক ক্ষেত্রে মিল রয়েছে।

আলোচিত চতুর্থ কারণ : ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র

বিশ্বের সর্বত্রই সাধারণ আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী দলসমূহ জঙ্গিবাদের বিরোধিতা করছেন এবং নিন্দা করছেন। সাধারণভাবে তাঁরা উপরের তিনটি কারণকে জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ বলে স্বীকার করেন না। বরং তাঁরা দাবী করেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের দমননীতি চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কারণেই এই জঙ্গিবাদের উত্থান। ইসলামকে কলঙ্কিত করতে, ইসলামী দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নতি বন্ধ করতে এবং এ সকল দেশে সামরিক আধিপত্য বিস্তার করতেই পাশ্চাত্যের ক্রীড়নকরা গোপন অর্থায়নে কিছু মুসলিম যুবককে বিভ্রান্ত করে এরূপ জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করেছেন।

তাঁরা তাদের এই দাবীর পক্ষে যদিও কোনো অকাট্য প্রমাণ পেশ করতে পারেন না, তবে অনেক যুক্তি পেশ করেন। তাঁরা দাবী করেন এই বোমাবাজি, অশান্তি, সন্ত্রাস এগুলো মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে কখনো দেখা যায়নি। পাশ্চাত্যের 'সভ্যতার সংঘাত' থিওরি আবিষ্কারের পূর্বে বিগত দেড় হাজার বছর ধরে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 'জিহাদ' নামে এরূপ সন্ত্রাস কখনোই দেখা যায়নি। রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোথাও কোনো মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে কাউকে গুপ্ত হত্যা করেছে, কারো বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করেছে........ইত্যাদির কোনো নজির নেই। 'সভ্যতার সংঘাত' থিওরি আবিষ্কারের পরে পাশ্চাত্য বিশ্ব নিজ প্রয়োজনেই এই অবস্থা তৈরি করেছে।

দীর্ঘ অর্ধ সহস্র বছর যাবত ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে ইউরোপীয় খৃস্টানগণ। ১ম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন ও মুসলিম বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ক্রুসেডের সমাপ্তি হয়েছে বলে ধারণা করেছিল তারা। বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পরে তারা হিসাব নিকাশ পাল্টে ফেলে। তারা 'সভ্যতার সংঘাতের' থিওরী উপস্থাপন করে। তারা ভালভাবেই উপলব্ধি করে যে, মুসলিম বিশ্বকে তার নিজ গতিতে অগ্রসর হতে দিলে একবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই মুসলমানগণ 'বিশ্ব শক্তিতে' পরিণত হবে। অর্থনৈতিক স্থিতি, প্রযুক্তিগত শক্তি ও সমর শক্তিতে তারা শক্তিশালী হয়ে

যাবে এবং তাদের 'নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরানোর' কোনো সুযোগ থাকবে না। মুসলিম উম্মাহকে ঠেকাতে হলে তাদেরকে আঘাত করতে হবে।

কিন্তু আঘাত তো কোনো 'কারণ' ছাড়া করা যায় না। স্বভাবতই কোনো মুসলিম দেশই পাশ্চাত্যের সাথে কোনো সংঘাতে যেতে রাজি নয়। কিন্তু সংঘাত না হলে তো কাজ উদ্ধার করা যাচ্ছে না। বিশেষত দুর্বলকে সংঘাতের মধ্যে নামাতে পারলে বিজয় নিশ্চিত থাকে। এজন্যই পাশ্চাত্য এই জঙ্গিবাদের জন্ম দিয়েছে।

এ সকল মুসলিম পণ্ডিত আফগান জিহাদকে অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেন। সোভিয়েত আগ্রাসনের প্রতিবাদে আফগানিস্তানের মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রতিরোধ শুরু করে। আমেরিকা এই সুযোগে এ সকল প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে অস্ত্র, ট্রেনিং, প্রযুক্তি ও সকল প্রকার সাহায্য দিয়ে এগিয়ে নেয়। সারা বিশ্বে এদের পক্ষে প্রচার চালায়। এরপর তারা তাদেরকে উস্কানির মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করে। তারা বেপরোয়া হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলে। পরিত্যক্ত ও উত্তেজিত এ সকল মানুষ আবেগ তাড়িত হয়েও অনেক কাজ করতে থাকে। এছাড়া এ সকল মুজাহিদদের মধ্যে আমেররিকার নিজস্ব অনুচর এদেরকে 'সংঘাতের পথে' যেতে প্ররোচিত করেছে। এরা জিহাদ ও কিতাল বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলোর অপব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহকে 'প্রিম্যাচিউরড' সংঘাতের পথে যেতে উস্কানি দিচ্ছে। এভাবে সারা মুসলিম বিশ্বে 'জিহাদের' বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।

'ইসলামপন্থীদের এই দাবীর যুক্তি যত জোরালোই হোক তার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। এছাড়া এই দাবীও সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ সহায়তা করে না। সর্বোপরি, শত্রু তো শত্রুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেই। যদি কেউ সত্যিই ইসলামের শত্রু হয় তবে সে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এজন্য তাদের দোষ দেয়া বা তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা অর্থহীন কর্ম। আমাদের দেখতে হবে কি কারণে মুসলিম যুবকগণ তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে। কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিকার না করতে পারলে আমাদের দোষারোপ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁদের ষড়যন্ত্র সফলতা লাভ করবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় যে, উপর্যুক্ত চারটি বিষয় ছাড়াও জঙ্গিবাদের উত্থান ও প্রসারের পিছনে কার্যকর অন্যান্য কারণ সন্ধান করা প্রয়োজন। বস্তুত ইসলামের নামে সন্ত্রাসের উত্থানের পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। কোনো বিষয় সন্ত্রাস উস্কে দিচ্ছে, কোনো বিষয় জঙ্গিবাদীরের প্রচারণায় ইসলাম-প্রেমিক সরল-প্রাণ যুবক-যুবতীদের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারছে। কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিকার করতে পারলে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে তা সহায়ক হবে বলে মনে হয়। এগুলোর মধ্যে কিছু কারণ সৃষ্টি করেছেন অমুসলিমগণ এবং কিছু কারণ সৃষ্টি করেছেন মুসলিমগণ। মুসলিমদের সৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে কিছু রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক এবং কিছু ধর্মীয়। এখানে এই জাতীয় কিছু সম্ভাব্য কারণ আলোচনা করছি।

১. বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন

ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থানের প্রধান কারণ বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের উপর নির্বিচার অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ। ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান চেচনিয়া, ইরাক, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, চীন ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্বিচার জুলুম, অত্যাচার ও জাতিগত নিধন-যজ্ঞ (ethnic cleansing) চলছে। এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের অদম্য আবেগই জঙ্গিবাদের জন্ম দিচ্ছে। মানুষ যখন নির্বিচার অত্যাচারের প্রতিবাদে আইনগতভাবে কিছুই করতে পারে না তখন বে-আইনীভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে এবং তার বে-আইনী কর্মকে 'আদর্শিক' ছাপ দেয়। এছাড়া সারা বিশ্বের মুসলিম মানস এই নিধনযজ্ঞের অবসান ও মুসলিম সভ্যতার বিজয় কামনা করছে। জঙ্গিবাদীরা এদেরকে সহজেই বুঝাতে পারছে যে, তাদের পথই নিধনযজ্ঞের অবসানের ও মুসলিম সভ্যতার বিজয়ের কার্যকর পথ। এক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধান বিচার বিশ্লেষণ, আলেমদের মতামত, ফলাফলের পরিণতি ইত্যাদির চেয়ে আবেগই বেশি কার্যকর।

মার্কিন সরকারের হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ গ্রহণ বা জুলুমের প্রতিকার করতে আবেগী যুবক যদি সাধারণ মার্কিন নাগরিককে বা মার্কিনীদের সাথে সহযোগী বলে অন্য কোনো দেশ ও ধর্মের কোনো মানুষকে হত্যা করে তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কঠিন অন্যায় ও পাপের মধ্যে নিপতিত হবে।

এখানে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনাযোগ্য : ১. ইসলাম অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায় পদ্ধতিতে করতে অনুমতি দেয় না। ২. ইসলাম একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি প্রদানের অনুমতি দেয় না, ৩. ইসলাম কোনো ব্যক্তি দল বা গোষ্ঠীকে বিচার বা শাস্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণের অনুমতি দেয় না। এজন্য প্রাজ্ঞ আলেমগণ এ সকল ক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে, শান্তিপূর্ণভাবে সহিংসতা বর্জন করে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপনের উৎসাহ দেন। কিন্তু আবেগী যুবকদের কাছে শান্তিপ্রিয় আলেমদের মত দুর্বলতা বা দালালী বলে মনে হয়। এই পরিস্থিতিতে 'কতিপয় আবেগী আলেমের' 'ফাতওয়া' তাদের কাছে যুগোপযোগী, সঠিক ও দ্রুত ফললাভের সহায়ক বলে মনে হয়। এভাবেই জঙ্গিবাদের উত্থান ও প্রসার ঘটতে থাকে।

২. বেকারত্ব ও হতাশা

মার্কিন ও পাশ্চাত্যের আগ্রাসন ও নিপীড়নের ক্ষোভ সকল মুসলিম দেশে বিদ্যমান থাকলেও জঙ্গিবাদী কার্যক্রম সকল দেশে সমানভাবে বিস্তার লাভ করেনি। ইন্দোনেশিয়ায় যেরূপ সন্ত্রাসী কার্যক্রম লক্ষ করা যায়, মালয়েশিয়াতে তা পাওয়া যায় না, অথচ ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, মাদ্রাসার সংখ্যাধিক্য এবং আমেরিকা ও পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাব মালয়েশিয়াতে বেশি। এর বড় কারণ সম্ভবত মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পাশ্চাত্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের সুস্পষ্ট মতামত। কর্মব্যস্ত ও পরিতৃপ্ত মানুষের মনে ক্ষোভ বা আবেগ বেশি স্থান পায় না। এছাড়া রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে তাদের মনের আবেগ প্রতিধ্বনিত হয়। ফলে তা প্রকাশের জন্য গোপন

পথের সন্ধান করে না। পক্ষান্তরে বেকারত্ব, সামাজিক বৈষম্য বা প্রশাসনিক অনাচারের শিকার মানুষের মনের ক্ষোভ ও হতাশাকে এ সকল আবেগ আরো উস্কে দেয়। এছাড়া এরূপ মানুষকে সহজেই বুঝানো যায় যে, এভাবে বোমা মেরে ভীতি সৃষ্টি করলেই তোমার মত অগণিত মানুষের বেকারত্ব বা অত্যাচার শেষ হয়ে শান্তির দিন এসে যাবে।

৩. আধুনিক আবেগী আলেমদের উত্থান

কুরআনের পরিপূর্ণ অধ্যয়ন, বিশাল হাদীস ভাণ্ডারের মৌলিক জ্ঞান, রসূলুল্লাহ স.-এর সহচর-সাহাবীগণের কর্ম, চিন্তা, মতামত ও কুরআন-হাদীস ব্যাখ্যার প্রক্রিয়া অধ্যয়ন এবং সমস্যা সমাধানে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর নেতৃস্থানীয় আলেম, ফকীহ ও ইমামদের মতামত ও কর্মধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের পরেই একজন মানুষ প্রকৃত ফকীহ বলে গণ্য হন এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রিয় সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলামী 'ফাতওয়া' বা সিদ্ধান্ত ও সমাধান দানের যোগ্যতা অর্জন করেন। যুগে যুগে এরূপ আলেম ও ফকীহগণই মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। স্বভাবতই এরূপ আলেমদের সংখ্যা সমাজে কম থাকে। এজন্য মুসলিম উম্মাহর আলেমগণের রীতি হলো জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে সমকালীন প্রাজ্ঞ আলেমগণের মতামত গ্রহণের পাশাপাশি পূর্ববর্তী প্রখ্যাত আলেমগণের মতামতের অনুসন্ধান ও তাদের মতামতের আলোকে তাঁরা সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন।

ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস কুরআন ও হাদীস। যে কোনো ব্যক্তি কুরআন-হাদীস পাঠ করলে ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করবেন। ইসলাম সকলকেই এভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু কখনোই সকলকেই 'ফাতওয়া' বা সিদ্ধান্ত প্রদানের অনুমতি দেয় না। শুধু কুরআনের কিছু আয়াত বা কিছু হাদীস পাঠ করে নিজের বুদ্ধি ও আবেগের রঙে রঞ্জিত করে 'ফাতওয়া', সিদ্ধান্ত বা সমাধান প্রদান করার প্রবণতা ভয়ঙ্কর।

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম আত্মঘাতী, রক্তাক্ত ঘটনার মূল কারণ ছিল এই প্রবণতা। ৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ) ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান হযরত উসমান ইবনু আফ্ফান রা. কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তারা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে হযরত আলী রা. খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু হযরত উসমান রা. নিযুক্ত সিরিয়ার গভর্নর হযরত মু'আবিয়া রা. আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবী জানান, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী জবাবে বলেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোলাটে হয়ে গৃহ যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। শুরু হয় সিফ্ফীনের যুদ্ধ। সিফ্ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে

থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিশী মজলিস গঠন করেন।

এই পর্যায়ে আলীর রা. অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। হযরত আলী তাদের ব্যাপারে বলেন, 'খারেজুন আন্না' তারা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তখন থেকেই তারা 'খারেজী' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। এরা সকলেই ছিল অত্যন্ত ধার্মিক, রাত-দিন কুরআন পাঠকারী ও রাতভর তাহাজ্জুদ আদায়কারী আবেগী মুসলমান, যারা রসূলুল্লাহর স. ইন্তেকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা দাবী করেন, একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও বিধান ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর বিধান হলো, ইসলামের শত্রুদের সাথে লড়তে হবে। কাজেই এ বিষয়ে মানুষকে সালিশ করার ক্ষমতা প্রদান অবৈধ। এ কারণে তারা আলী, মু'আবিয়া ও তাদের সঙ্গী সাহাবীগণসহ সকল মুসলমানকে কাফের ঘোষণা দিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত করতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. ও অন্যান্য সাহাবীরা তাদেরকে এই মর্মে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রসূলুল্লাহ স.-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবী করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোশকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। এদের ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। অনেক নিরপরাধ অযোদ্ধাসহ হাজার হাজার মুসলিমের প্রাণহানি হয় তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের কারণে। আর এ সবকিছুর মূল কারণ ছিল ইসলাম বুঝার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত মনে করা এবং অধিকতর অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলেমদের মতামতকে অবজ্ঞা করা।[২]

৪. জিহাদ পরিভাষার বিকৃতি

জঙ্গিবাদের প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হলো 'জিহাদ' শব্দের অপব্যবহার করে ইসলাম প্রেমিক মানুষদেরকে প্রতারিত করা। এজন্য বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক. জিহাদ ও কিতাল

'জিহাদ' অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, শ্রমব্যয় ইত্যাদি। আল্লাহর বিধান পালনের ও প্রতিষ্ঠার সকল প্রকার শ্রম বা প্রচেষ্টাকেই কুরআন ও হাদীসে 'জিহাদ' বলা হয়েছে। তবে ইসলামী পরিভাষায় ও ইসলামী ফিকহে জিহাদ বলতে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বুঝানো হয়। আর এই যুদ্ধেরই নাম হলো কিতাল। কুরআন ও হাদীসে জিহাদ ও কিতালের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কতল অর্থ হত্যা করা। আর কিতাল অর্থ পরস্পর যুদ্ধ করা। এজন্য জিহাদ বা কিতালের মূল শর্ত হলো সামনাসামনি 'যুদ্ধ'। পিছন থেকে হত্যা করা, না জানিয়ে হত্যা করা, গুপ্ত হত্যা করা এগুলো কখনোই ইসলামী কিতাল বা জিহাদ নয়। মদীনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রসূলুল্লাহ-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অনেক 'কিতাল' করেছেন। দু'একটি ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে যথাসম্ভব কম রক্তপাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গোপন অভিযান পরিচালনা করা হলেও যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কাফেরদের দেশে যেয়ে গোপনে হত্যা, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি কখনোই তিনি করেননি বা করার অনুমতি প্রদান করেননি। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও অযোদ্ধাকে আঘাত করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

খ. ইসলামে কতল বা হত্যা

ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত বস্তু হলো মানব জীবন। মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। শুধুমাত্র 'আইনানুগ বিচার' অথবা 'যুদ্ধের ময়দান' ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করা, সন্ত্রস্ত করা, আঘাত করা, কষ্ট দেয়া বা কোনোভাবে কারো ক্ষতি করা কঠিনতম হারাম কর্ম। কোনো ধর্মের কোনো মানুষকেই উপরের দুটি অবস্থা ছাড়া হত্যা করা, আঘাত করা বা কষ্ট দেয়া যাবে না। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অগণিত নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে 'মানব রক্ত' কঠিনতম হারাম। একমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে 'মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই' একজন মানুষের হত্যা বৈধ করা হয়েছে। একান্ত প্রয়োজনে বিশেষ মুহূর্তে মানুষের রক্তপাত বৈধ করা হয়। শুধু দুটি ক্ষেত্রে তা হয়: বিচার ও যুদ্ধ। বিচারের ক্ষেত্রে নরহত্যা, বিবাহিতের ব্যভিচার ও স্বেচ্ছায় বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ করার পরে ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার বিধান আছে। এজন্য অনেক কঠিন শর্ত রয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো বিচারক সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন মৃত্যুদণ্ড না দেয়ার। অপরাধের পূর্ণতার বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও আর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যাবে না।'[৩]

এই বিচার অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যথাযথ বিচারকের আদালতে যথাযথ সাক্ষ, প্রমাণ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে। এই প্রক্রিয়ার বাইরে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান বিচারপতিও কাউকে শাস্তি দিতে পারেন না। উমর রা. আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রা.-কে বলেন, 'আপনি শাসক থাকা অবস্থায় যদি কাউকে ব্যভিচারের অপরাধে বা চুরির অপরাধে রত দেখতে পান তাহলে তার বিচারের বিধান কি? (নিজের দেখাতেই কি বিচার করতে পারবেন?)' আব্দুর রাহমান রা. বলেন, 'আপনার সাক্ষও একজন সাধারণ মুসলিমের সাক্ষের সমান।' উমর রা. বলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।'[৪] অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান নিজের হাতে বিচার তুলে নিতে পারবেন না। এমনকি তার সাক্ষেরও অতিরিক্ত কোনো মূল্য নেই। রাষ্ট্রপ্রধানের একার সাক্ষে কোনো বিচার হবে না। বিধিমোতাবেক দুজন বা চারজন সাক্ষীর কমে বিচারক কারো বিচার করতে পারবেন না।

অন্য এক ঘটনায় উমর রা. রাত্রে মদীনায় ঘোরাফেরা করার সময় এক ব্যক্তিকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান। তিনি পরদিন সকালে সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন, যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান তাহলে তিনি কি শাস্তি প্রদান করতে পারবেন? তখন আলী রা. বলেন, কখনেই না। আপনি ছাড়া আরো তিনজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী যদি অপরাধের সাক্ষ না দেয় তাহলে আপনার উপরে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।[৫]

গ. ইসলামে কিতাল বা যুদ্ধ

কিতাল বা পারস্পরিক যুদ্ধের ক্ষেত্রেও ইসলাম অগণিত শর্ত আরোপ করেছে। সর্বপ্রথম শর্ত হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কিতাল/জিহাদ কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম দাওয়াত বা প্রচার। কিতাল হলো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তার মাধ্যম। রসূলুল্লাহ্ দাওয়াতের মাধ্যমে 'ইসলামী সমাজ' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে দাওয়াতের ভিত্তিতে মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নিতে আগ্রহী হন। তখন তাঁরা রসূলুল্লাহ-কে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামের বিরোধিতাকারীরা এই নতুন রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেষ্টা করে। তখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের জান, মাল ও ধর্মীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের বিধান প্রদান করা হয়। এজন্য জিহাদ বা কিতাল বৈধ হওয়ার জন্য 'রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপতি বা 'ইমাম' শর্ত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ বলেন,'রাষ্ট্রপ্রধান হলেন ঢাল, যাকে সামনে রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে।'[৬]

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রপ্রধান ধর্মপরায়ন হোক আর ধর্মপালনে নিষ্ঠাবান না হোক, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর আনুগত্যে জিহাদ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব।' অন্য বর্ণনায়: 'জালেম শাসকের জুলুম ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতা কোনোটিই জিহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাধা হবে না।'[৭]

জিহাদ বা কিতালের অন্য শর্ত হলো, শত্রুপক্ষ রাষ্ট্র আক্রমণ করবে বা তার নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে, 'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।'[৮]

কিতালের অন্য শর্ত হলো, শুধুমাত্র যারা যুদ্ধ করতে অস্ত্রধারণ করে সামনে এসেছে তাদেরই সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

'তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমালঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ভালবাসেন না।'[৯]

এই অর্থে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রেও কাউকে হত্যা করার অগণিত শর্ত রয়েছে। যুদ্ধকারী যুদ্ধের জন্য সম্মুখে অস্ত্রসহ উপস্থিত থাকবে। যুদ্ধের আগে তাকে

সন্ধি, আত্মসমর্পণ, ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া প্রদান ইত্যাদির সুযোগ দিতে হবে। এ সকল শর্তসহ যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের সময় একেবারে অস্ত্রাঘাতের সময়ও যদি কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে তবে তাকে আর আঘাত করা যাবে না।....ইত্যাদি অগণিত শর্ত বিদ্যমান। একজন ডাক্তার যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা করেন রোগীর অঙ্গচ্ছেদ না করে চিকিৎসা করার– একান্ত বাধ্য হলেই কেবল তার কোনো অঙ্গ কেটে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেন; তেমনি ইসলামে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করার।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেও যতগুলো আইনানুগ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সবগুলোতেই রসূলুল্লাহ স. সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব কম প্রাণহানী ঘটাতে। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু তিনি শত্রুপক্ষের নাগরিক ও যোদ্ধাদেরও প্রাণহানী কমাতে চেয়েছেন। বস্তুত ইসলাম যুদ্ধকে যে মানবিক রূপ প্রদান করেছে তা অন্য কোনো ধর্মেই পাওয়া যায় না। এখানে একটি তুলনা দেখুন। বাইবেলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে বেসামরিক মানুষদের এবং বিশেষ করে সকল পুরুষ শিশুকে এবং সকল বিবাহিত নারীকে নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র কিশোরী কুমারী মেয়েদেরকে ভোগের জন্য জীবিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোনো দেশ যুদ্ধ করে দখল করতে পারলে তার সকল পুরুষ অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে এবং নারী ও শিশুদেরকে ভোগের জন্য রাখতে হবে। আর সেই দেশ যদি ইহুদীদের দেশের নিকটবর্তী কোনো দেশ হয় তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তথাকার সকল মানুষকে হত্যা করতে হবে। বাইবেলে বলা হয়েছে, 'Kill every male among the little ones, and kill erery woman that hath known man by lying with him. But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves.'১০ '13. And when the LORD the God hath delivered it into thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the swore; 14. but the women, and the little ones, and the cattle, and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat the spoil of thine enemies, which the LORD thy God hath given thee. 15. Thus shalt thou do unto all the cities which are very far from thee, which are not of the cities of these nations. 16 But of the cities of these which the FORD thy God doth give thee for an inheritance, thou shalt save alive nothing that breatheth; 17. but thou shalt utterly destroy them.'[11]

পক্ষান্তরে হাদিসের নির্দেশ হলো, 'যুদ্ধে তোমরা ধোকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মযাজককে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো জনপদ ধ্বংস

করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণী বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটবে না....। তোমরা দয়া ও কল্যাণ করবে, কারণ আল্লাহ দয়াকারী-কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।[১২]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, কতল ও কিতাল বা হত্যা মূলত ইসলামে একটি নিষিদ্ধ কর্ম। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোনা কাফেরকে হত্যা করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ও অন্যান্য সাহাবী বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা অমুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বছরের দূরত্ব থেকে লাভ করা যায়।'[১৩]

শত্রু রাষ্ট্র বা শত্রুতায় লিপ্ত অমুসলিমদের সাথেও পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে, 'তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দিয়েছিল বলে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে।'[১৪]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে, 'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে।'[১৫]

ঘ. জিহাদ বনাম সন্ত্রাস

এভাবে আমরা দেখছি যে, সন্ত্রাস ও জিহাদের মূল পার্থক্য হলো, জিহাদ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধ আর সন্ত্রাস ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধ বা সহিংসতা। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, জিহাদ ও কিতাল আইনানুগভাবে পরিচালিত যুদ্ধ যেখানে শুধু যুদ্ধে জড়িত যোদ্ধাদেরকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে। এই বিধান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আর সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে যোদ্ধা অযোদ্ধা নির্বিচারে হত্যা করা হয়, যা ইসলামে সবচেয়ে ঘৃণিত একটি অপরাধ।

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এজন্য কুরআন ও হাদিসে মানব জীবনের সকল দিকের বিধিবিধান বিদ্যমান। কোনো বিধান ব্যক্তিগতভাবে পালনীয়, কোনো বিধান সামাজিকভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। প্রত্যেক বিধান পালনের জন্য নির্ধারিত শর্তাদি রয়েছে। কুরআনে 'সালাত' প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার কুরআনে 'চোরের হাত কাটার', 'ব্যভিচারীর বেত্রাঘাতের' ও জিহাদ বা কিতালের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। অন্য কেউ পালন না করলেও মুমিনকে ব্যক্তিগতভাবে পালন করতেই হবে। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্দেশটি 'রাষ্ট্রীয়ভাবে' পালনীয়। কখনোই একজন মুমিন তা ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে পালন করতে পারেন না।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো ইবাদতের শর্তাবলী কুরআনে কখনোই একত্রে বা একস্থানে উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া অধিকাংশ ইবাদতের সকল শর্ত কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। কুরআন ও হাদিসের সামগ্রিক বিধান বা রসূলুল্লাহ স. এর সামগ্রিক জীবন ও এসকল নির্দেশ পালনে তাঁর

রীতি-পদ্ধতি থেকেই সেগুলোর শর্ত ও পদ্ধতি বুঝতে হবে। দু'একটি আয়াত বা হাদিস সামনে রেখে মনগড়া অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমেই বিভিন্ন ইসলামী পরিভাষার বিকৃতি ঘটানো হয়। কুরআনে বারংবার সালাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উপরন্তু নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে।'[১৬]

এই নির্দেশের উপর নির্ভর করে যদি কেউ সূর্যাস্তের সময় সালাতে রত হন তবে তিনি নিজে যতই দাবী করুন, মূলত তা ইসলামী ইবাদত বলে গণ্য হবে না, বরং তা পাপ ও হারাম কর্ম বলে গণ্য হবে। কারণ রসূলুল্লাহ স. হাদিস শরীফে 'সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাত্রি পর্যন্ত' সময়ের মধ্যে সালাত আদায়ের বৈধ ও অবৈধ সময় চিহ্নিত করেছেন এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় অবৈধ করেছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে রসূলুল্লাহ স.-এর শিক্ষার বাইরে মনগড়া কুরআন করীমের অর্থ বা ব্যাখ্যা করা আমাদেরকে ইবাদতের নামে পাপের মধ্যে লিপ্ত করে।

অনুরূপভাবে কুরআনে 'কিতালের' নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে এই ইবাদত পালনের অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে কতিপয় শর্ত আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। কেউ যদি সেগুলো পূরণ না করে হত্যা, খুন, রক্তপাত ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়ে এগুলোকে জিহাদ বলে দাবী করেন, তবে তা কখনোই ইসলামী ইবাদত বলে গণ্য হবে না, বরং তা পাপ ও হারাম কর্ম বলে গণ্য হবে।

শর্ত পূরণ না করে সালাত আদায় করার চেয়েও অনেক ভয়ঙ্কর পাপ শর্ত পূরণ ছাড়াই কতল বা কিতালে লিপ্ত হওয়া। সালাত ও কিতালের মধ্যে পার্থক্য হলো, সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করলে উক্ত ব্যক্তি গোনাহগার হলেও, তাতে কোনো বান্দার হক নষ্ট হবে না। কিন্তু কিতালের সাথে 'বান্দার' হক জড়িত। কাউকে ভীতি প্রদর্শন করা, রক্তপাত করা, হত্যা করা, সম্পদ নষ্ট করা কঠিনতম কবীরা গোনাহ, যা স্বয়ং আল্লাহও ক্ষমা করেন না। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে কাফের রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সাথে ঘোষিত ও আইনানুগ যুদ্ধের বাইরে যদি কেউ হত্যা, আঘাত, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হন, তবে ইবাদত কবুল না হওয়া এবং গোনাহগার হওয়া ছাড়াও তিনি বান্দার হক নষ্ট করার ভয়ঙ্করতম পাপে লিপ্ত হবেন।

৬. ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ ও সন্ত্রাস

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদের নামে সন্ত্রাস প্রথম উদ্ভাবন করেন খারেজী সম্প্রদায়। তাদের বিষয়ে আগেই উল্লেখ করেছি যে, তারা 'আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম চলবে না' এই দাবীতে হযরত আলীর রা. বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ইসলামী আইন বা আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। এদের মূল বিভ্রান্তিই ছিল 'জিহাদ' বা কিতালকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরে 'গোষ্ঠী' বা গ্রুপের হাতে নিয়ে যাওয়া। তাদের 'ভার্সন' অনুসারে যাদেরকে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বলে মনে করত তাদের সাথে তারা যুদ্ধ করত। এখানে লক্ষণীয় যে, এই বিভ্রান্ত 'খারেজী' সম্প্রদায় 'যুদ্ধ' করেছে কিন্তু তারা 'গুপ্তহত্যা' করেনি। পক্ষান্তরে আরেকটি বিভ্রান্ত

সম্প্রদায় 'গুপ্তহত্যা' করত। এরা ছিল বাতিনী শিয়া সম্প্রদায়। এরা নিজেদের ভার্সন অনুসারে 'ইসলাম' প্রতিষ্ঠার জন্য গুপ্তহত্যা করত।

এই দুই বিভ্রান্ত সম্প্রদায় তাদের এই 'জিহাদ' মূলত কাফেরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করত না। বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত করত। তাদের বিভ্রান্তি চালু করার জন্য তারা তাদের মতের বাইরে সকল মুসলিমকে কাফের বলে ফাতওয়া জারি করত। এরপর তাদের বিরুদ্ধে ঢালাও জিহাদের ফাতওয়া দিত। এরপর জিহাদের নামে ঢালাও নরহত্যা বা গুপ্তহত্যা চালাত।

ইসলামের ইতিহাসে আমরা অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ ইত্যাদি দেখতে পাই, যেগুলো যুদ্ধের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসে উল্লিখিত শর্তগুলো পুরোপুরি পূরণ করে না। এগুলো মানবীয় দুর্বলতার ফল। ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত এগুলো অবৈধ। তবে কোনো ক্ষেত্রেই যুদ্ধের ময়দানের বাইরে গুপ্তহত্যা, নির্বিচার হত্যা ইত্যাদিতে এই দুই বিভ্রান্ত গোষ্ঠী ছাড়া কেউ জড়িত হননি।

পরবর্তীকালের দুটি 'জিহাদের' বিষয় আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে: সাইয়েদ আহমদ বেরলবীর জিহাদ ও আফগান জিহাদ। প্রথম জিহাদে সাইয়েদ আহমদ বেরলবী জিহাদের শর্তগুলো পূরণ করেছিলেন। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা পরিত্যাগ করে ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের শর্ত পূরণ করেছিলেন। তিনি শিখদেরকে অত্যাচারী এবং বৃটিশদেরকে আক্রমণকারী ও দখলদার বাহিনী হিসেবে গণ্য করে জিহাদের বৈধতার সৃষ্টি করেন। আফগান জিহাদও শুরু হয়েছিল প্রায় একইভাবে সোভিয়েত নিযুক্ত পুতুল সরকারের অত্যাচার এবং সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ ও জবর দখলের মুখে। আফগান জনগণ আমীরদের নেতৃত্বে জিহাদ শুরু করেছিলেন। সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বে এই জিহাদ বৈধ জিহাদ বলেই মনে করা হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের অনেক মুসলিম যুবক এই জিহাদে অংশগ্রহণ করে। সোভিয়েত বাহিনীর পরাজয়ের পরে এই জিহাদ আন্তঃদলীয় ও আন্তঃগোত্রীয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। দীর্ঘদিন যুদ্ধে অভ্যস্ত আফগান জনগণ অস্ত্রের ভাষাতেই কথা বললেন স্বদেশীয় ও স্বধর্মীয় বিরোধীদের সাথে। প্রত্যেকেই নিজের কাজকে জিহাদ এবং প্রতিপক্ষকে ইসলামের শত্রু বলে দাবী করলেন। বাইরে থেকে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ স্বভাবতই কোনো না কোনো আফগান পক্ষে থেকে একই কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অনেকে আফগানিস্তান ত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এসব যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের অনেকের মধ্যে সশস্ত্র জিহাদের ঝোঁক থেকে যায়। এদের অধিকাংশই জিহাদের শর্তের চেয়ে জিহাদের ফযীলতের বিষয়েই বেশি জানতেন ও ভাবতেন। তাদের কেউ কেউ নিজ নিজ দেশেও 'জিহাদী' পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করেন।

৭. প্রতিপক্ষকে কাফের বলার প্রবণতা

জিহাদের নামে কাউকে হত্যা করতে হলে তাকে 'কাফের' ও ইসলামের শত্রু প্রমাণ করা খুবই জরুরী। নইলে মুসলিম মানস সহজে এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ বা সমর্থন মেনে নেবে না। এজন্য আমরা দেখেছি যে, প্রাচীন জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীরা তাদের প্রতিপক্ষ মুসলমানদেরকে

ঢালাওভাবে কাফের বলে ঘোষণা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা গুপ্তহত্যা অভিযান পরিচালনা করত। বর্তমানে বিভিন্ন ইসলামী কর্মে লিপ্ত কিছু মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এই জাতীয় কিছু ধারণা জঙ্গিদের জন্য প্রতিপক্ষদেরকে ঢালাওভাবে 'কাফের' বা ধর্মত্যাগী বলার সুযোগ করে দিচ্ছে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, খারেজীগণ সর্বপ্রথম পাপের কারণে মুসলমানকে 'কাফের' বলতে শুরু করে। কোনো কোনো বিভ্রান্ত মুসলিম গোষ্ঠী বা দল এরূপ মত পোষণ করেছেন। পক্ষান্তরে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অগণিত হাদিসের আলোকে সাহাবীগণের যুগ থেকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বা মূলধারার মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিতে ইসলামের মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করছেন, তাকে কোনো পাপের কারণে 'অমুসলিম', কাফের বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না, যতক্ষণ না তিনি সুস্পষ্টভাবে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো বিশ্বাস পোষণ করে ঘোষণা দেবেন। ইসলামী আইন লঙ্ঘনকারী বা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী মুসলিম পাপী মুসলিম বলে গণ্য হবে। কখনোই তাকে পাপের কারণে 'অমুসলিম' বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা হবে না। তবে যদি তার এই পাপ বা অবাধ্যতাকে তিনি বৈধ মনে করেন বা ইসলামী বিধানকে বাজে, ফালতু, অচল বা অপালনযোগ্য বলে মনে করেন তবে তা কুফরী বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে।[১৭]

গত অর্ধ-শতাব্দী যাবত বিভিন্ন মুসলিম দেশে, বিশেষত মিসর, সুদান ও মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশে কিছু আবেগপ্রবণ 'অর্ধ-আলেম ধর্মগুরু' প্রাচীন খারেজীদের মতই পাপে লিপ্ত হওয়া বা ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করাকে 'কুফরী' বা ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্মত্যাগ বলে মত প্রকাশ করতে থাকেন। বিশেষত তারা দাবী করতে থাকেন যে, আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জালেম শাসকগণ যেহেতু 'ইসলামী' আইনে বিচার করেন না, বা ইসলাম বিরোধী আইনে বিচার করেন, সেহেতু তারা সকলেই কাফের ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ। এরপর তারা বলতে থাকেন যে, এ সকল রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারকারী সকল নাগরিক কাফের ও ধর্মত্যাগী। এদের মধ্যে একটি সুপরিচিত দল মিসরের শুকরী আহমদ মুস্তফা প্রতিষ্ঠিত 'জামাআতুল মুসলিমীন'। এরা এক পর্যায়ে তাদের দলভুক্ত হতে আপত্তি করে এমন সকল মানুষকে কাফের-মুরতাদ হিসেবে গণ্য করে এবং এরূপ কাফের-মুরতাদদেরকে গুপ্তহত্যা করার জন্য দলের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ জারি করে। বিশেষত যে সকল আলেম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব এদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বিভ্রান্তি বুঝাতে চেষ্টা করতেন বা তাদের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে কথা বলতেন তাদেরকে তারা গুপ্তহত্যা করতে শুরু করে। যদিও মিসর সরকার এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, তবুও অনেক আবেগী মুসলিমের মধ্যেই তাদের এ সকল মতামতের প্রভাব থেকে যায়। এছাড়া আরো অনেক গোষ্ঠী ও দলের মধ্যে এরূপ চিন্তা বিভিন্নভাবে দেখতে পাওয়া যায়।[১৮]

এরা খারেজীদের মত কুরআনের কিছু আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করত। এছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, আইন, বিচার ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম বা ধর্মীয় নেতার বক্তব্য তারা নিজেদের পক্ষে পেশ করত।

বর্তমানে জঙ্গিদের মতবাদের অন্যতম ভিত্তি এই 'কাফের' বলার প্রক্রিয়া। একই পদ্ধতিতে তারা ঢালাওভাবে মুসলিম সমাজের মানুষদেরকে কাফের বলে ঘোষণা দিয়ে নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের পটভূমি তৈরি করছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, নেতা বা আলেমের কিছু আবেগী কথাকে তারা নিজেদের পক্ষে পেশ করছে। আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ করি, অনেক আলেম বা ইসলামী কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি রাজনৈতিক বিষয়াদিতে সহজেই বিভিন্ন কর্ম বা মতকে 'কুফরী' বলে অভিহিত করেন। তাঁরা কুফরীতে লিপ্ত মানুষদেরকে হত্যার ফাতওয়া কখনোই প্রদান করেন না। কিন্তু জঙ্গিদের হত্যাকাণ্ডের জন্য তাদের বক্তব্য কার্যকর পটভূমি তৈরি করে।

৮. দ্রুত ফলাফল লাভের ব্যস্ততা

দ্রুত ফলাফল লাভের আগ্রহ জঙ্গিবাদের উত্থানের আরেকটি কারণ। 'ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে বা ইসলামের বিজয় আনতে হবে। অমুক বা তমুক পদ্ধতিতে তা আসবে না, বরং আমাদের এই পদ্ধতিতেই এ বিজয় দ্রুত হাতের মুঠোয় এসে যাবে। অমুক পদ্ধতিতে শত বছর বা হাজার বছর কাজ করলেও ইসলামের বিজয় আসবে না, কিন্তু আমাদের পদ্ধতিতে কাজ করলে অল্প সময়েই তা এসে যাবে।' এরূপ প্রচারণা জঙ্গিদের কর্মী সংগ্রহের একটি বড় মাধ্যম।

জঙ্গিদের এই প্রচারণার জন্য একটি ভাল ক্ষেত্র ইতোমধ্যেই মুসলিম সমাজগুলোতে তৈরি হয়ে রয়েছে। সমাজে ইসলামী দাওআত প্রচার, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী কর্মরত রয়েছেন। ইসলামী শিক্ষা অনুধাবন করা, এর গুরুত্ব নির্ণয় করা এবং প্রচারের পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ সকল দলের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে এবং থাকাই স্বাভাবিক। তবে সবারই লক্ষ নিজ নিজ 'বুঝ' অনুসারে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও পরিপূর্ণ ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতি মানুষদের আহ্বান করা। কে কত পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামকে উপস্থাপন করতে পারছেন সেটিই এখানে মূল বিবেচ্য হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু অনেক সময় আবেগী ইসলাম প্রচারক এক্ষেত্রে 'কত তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যাবে' তা বিচার করতে শুরু করেন। তিনি বলতে থাকেন, 'অমুক পদ্ধতি ভাল নয়, কারণ ঐ পদ্ধতিতে কর্ম করে শত বছরে বা হাজার বছরেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।' মনে হয় কে কত তাড়াতাড়ি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারল এর উপরেই আল্লাহ্ নবী-রসূল ও মুসলমানদের হিসাব নিবেন।

ফলাফল লাভের জন্য ব্যস্ততা বা ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মের সফলতা বিচার ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম বিভ্রান্তি। এই ব্যস্ততার ফলে দুই প্রকারের বিভ্রান্তির জন্ম নেয়।

প্রথম বিভ্রান্তি : ফলাফলের দ্রুততার ভিত্তিতে কর্মের বিচার অথবা ফলাফল না পাওয়ার কারণে কর্মকে ব্যর্থ মনে করা। অনেক সময় আবেগী মুমিনের মনে ফলাফল লাভের উন্মাদনা তাকে বিপথগামী করে ফেলে। মুমিন চায় যে, সমাজ থেকে ইসলাম বিরোধী ও মানবতা বিরোধী সকল অন্যায় ও পাপ দূরীভূত হোক। কোনো মুমিনের মনে হতে পারে যে, এত ওয়ায, বক্তৃতা, বইপত্র, আদেশ নিষেধ ইত্যাদিতে কিছুই হলো না, কাজেই তাড়াতাড়ি কিভাবে সব অন্যায় দূর করা যায় তার চিন্তা করতে হবে। এই চিন্তা ভয়ঙ্কর ও ইসলামী শিক্ষার বিরোধী। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন, 'হে মুমিনগণ, তোমাদের উপরে শুধু তোমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।'[১৯]
তাহলে মুমিনের দায়িত্ব হলো নিজে সৎ থাকা ও অন্যদেরকে সৎপথের দিকে আহ্বান করা। আমাদের আহ্বান বা আদেশ-নিষেধ সত্ত্বেও যদি কেউ বা সকলেই বিপথগামী হয় তবে সেজন্য মুমিনের কোনো পাপ হবে না বা কোনো মুমিনকে সেজন্য আল্লাহর দরবারে দায়ী হতে হবে না। অনেক নবী শত শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন ও আদেশ-নিষেধ করেছেন, কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ সুপথপ্রাপ্ত হয়নি। এতে তাঁদের মর্যাদার কোনো কমতি হবে না বা তাঁদের দায়িত্ব পালনে কোনো কমতি হয়নি। কাজেই মুমিন কখনোই ফলাফলের জন্য ব্যস্ত হবে না। বরং নিজের দায়িত্ব কুরআন ও হাদীসের আলোকে পালিত হচ্ছে কিনা সেটাই বিবেচনা করবে।
দ্বিতীয়ত বিভ্রান্তি : দ্রুত ফলাফল লাভের জন্য ইসলাম নির্দেশিত পদ্ধতির বাইরে অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্ম দুভাবে আঞ্জাম দেয়া হয়ঃ (১) অরাষ্ট্রীয়, অর্থাৎ ব্যক্তিগত, দলগত বা গোষ্ঠীগতভাবে এবং (২) রাষ্ট্রীয়ভাবে। অরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দীন প্রতিষ্ঠার একটি মাত্রই মাধ্যম, তা হলো 'দাওয়াত' বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দাওয়াতের পাশাপাশি আরো দুটি মাধ্যম রয়েছেঃ (ক) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও (খ) প্রয়োজনে শত্রুরাষ্ট্রের কবল থেকে প্রতিষ্ঠিত দীন, রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জিহাদ বা কিতাল অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ করা।
সকল পর্যায়ে ও ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ হলো সহিংসতা ও সীমালঙ্ঘন বর্জন করা। শুধু সহিংসতা বর্জনই নয়, দাওয়াত, প্রচার, সৎকাজে আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ ইত্যাদি 'দীন প্রতিষ্ঠার' সকল কর্মে 'অহিংসতা' দ্বারা 'সহিংসতা'র প্রতিরোধ করতে এবং সহিংসতার প্রতিবাদে 'উত্তম' আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন করীমে এরশাদ করা হয়েছে, 'কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। (মন্দ) প্রতিহত কর উৎকৃষ্টতর (আচরণ) দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহাসৌভাগ্যবান।'[২০]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে, 'মন্দের মুকাবিলা কর যা উৎকৃষ্টতর তা দিয়ে, তারা যা বলে আমি সে সম্পর্কে বিশেষ অবহিত।'[২১]

যুদ্ধ যদিও একটি সহিংস কর্ম, তবুও ইসলাম তাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অহিংস ও যথাসম্ভব কম 'সহিংস' করতে নির্দেশ দিয়েছে বলে আমরা দেখেছি।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী দাওয়াত বা ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অনেক সময় ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিরোধ, অত্যাচার বা সহিংস আচরণের সম্মুখীন হয়। এতে দাওয়াতে লিপ্ত মুসলিমের মধ্যে প্রতিক্রিয়ামূলক 'সহিংসতা'র আবেগ তৈরি হয়। এর সাথে 'দ্রুত ফললাভে'র চিন্তা 'দাওয়াত' বা 'দীন' প্রতিষ্ঠার কর্মে রত ব্যক্তিকে ইসলাম নির্দেশিত এই 'অহিংস' পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আবেগ নির্দেশিত 'সহিংস' পথে যাওয়ার প্ররোচণা দেয়। তিনি ভাবতে থাকেন 'সহিংসতা' বা কল্পিত 'জিহাদ'ই দ্রুত ফললাভের বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ যদিও প্রকৃত সত্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের ইতিহাসে ব্যক্তি দল বা গোষ্ঠীর সহিংসতা, তথাকথিত 'জিহাদ' ও 'শাহাদতের' অনেক ঘটনা আছে। তারা সকলেই 'দ্রুত ফললাভের' আবেগ নিয়ে প্রকৃত বা কল্পিত 'জিহাদে' ঝাঁপিয়ে পড়ে 'শহীদ' হয়েছেন, কিন্তু কেউই দ্রুত বিজয় তো দূরের কথা কোনো বিজয়ই অর্জন করতে পারেননি। বস্তুত ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, 'অহিংস' ও 'মন্দের মুকাবিলায় উৎকৃষ্টতর' আচরণই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের বিজয়ের একমাত্র পথ। এই পদ্ধতিতে রসূলুল্লাহ স. আরবের কঠোর হৃদয় যাযাবরদের হৃদয় জয় করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেও সকল যুদ্ধে সর্বোচ্চ অহিংসতা অবলম্বন করেন।

ইসলামের জঙ্গিবাদের বিস্তারের উপরের কারণগুলোর প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যা একটি প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো, এ সকল কারণের দিকে বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যে কোনো সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ হলো সমস্যার কারণ চিহ্নিত করা। উপর্যুক্ত কারণগুলো প্রকৃতই জঙ্গিবাদের প্রসারের পিছনে কার্যকর কিনা, এগুলো ছাড়া অন্য কোনো কারণ রয়েছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে।

যে কোনো বৃহৎ সমাজে দুচারটি বিভ্রান্ত বা বিপথগামী গোষ্ঠী বা ব্যক্তি থাকতে পারে। কোনো রাষ্ট্র সমাজ থেকেই এদেরকে একেবারে নির্মূল করা যায় না। তবে এরূপ বিপথগামীরা যেন কোনোভাবেই সমাজের মধ্যে তাদের বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে এবং সমাজের জন্য দুষ্টক্ষতে পরিণত না হয় সেজন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

বাংলাদেশের মত সুশৃঙ্খল সমাজে জঙ্গিবাদের উত্থান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়। পাকিস্তান বা অন্য অনেক দেশে শিয়া-সুন্নি, ওহাবী-রেজভী ইত্যাদি ধর্মীয় দল-উপদলের মধ্যে সহিংসতা অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক 'ভায়োলেন্স' বা সহিংসতা কখনোই ছিল না। আমাদের দেশে এরূপ সহিংসতার মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারা কোনো ক্রমেই ছোট করে দেখার মত বিষয় নয়। মহান আল্লাহ আমাদের দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্তি, সহিংসতা ও হানাহানি থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

প্রমাণপঞ্জি

১. Letter of a reader, The daily Independent 14/1/2006.

২. নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা ৫/১৬৫-১৬৬।

৩. বায়হাকি, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৪. বুখারী।

৫. আল কানযুল আকবার ১/২২৭।

৬. বুখারী ও মুসলিম।

৭. আবু দাউদ।

৮. সূরা ২২: হজ্জ, আয়াত ৩৯।

৯. সূরা ২ বাকারা: আয়াত ১৯০।

১০. Number 31/17-18.

১১. Deuteronomy 20/13/16.

১২. বিস্তারিত বর্ণনাগুলোর জন্য দেখুন বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা ৯/৯০।

১৩. বুখারী ও মুসলিম।

১৪. সূরা মায়েদা, ২ আয়াত।

১৫. সূরা মায়েদা, ৮ আয়াত।

১৬. সূরা বনী ইসরাঈল, ৭৮ আয়াত।

১৭. বিস্তারিত দেখুন ইমাম আবু হানীফা, আল ফিকহুল আকবার (মোল্লা আলী কারীর ব্যাখ্যাসহ) পৃষ্ঠা ১১৭; ইমাম ত্বাহাবী, আল আকীদা আত ত্বাহাবীয়া (ব্যাখ্যাসহ) পৃষ্ঠা ৩১৬: ইবনু আবিল ইজ্জ, শারহুল আকীদা আতত্বাহাবীয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩১৫-৩১৬।

১৮. মুহাম্মাদ সুরূর বিন নাইফ, আল হুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহ, ওয়া আহলুল গুলু, পৃষ্ঠা ৯-১১।

১৯ সূরা মায়েদা, ১০৫ আয়াত।

২০. সূরা হা-মিম সাজদাহ (ফুসসিলাত), ৩৩-৩৫ আয়াত।

২১. সূরা মুমিনূন, ৯৬ আয়াত।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬
বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৫, পৃষ্ঠা : ১০২

জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ : আল কুরআনের বিধান

মুঃ শওকত আলী

শিশু হত্যা

নিজেদের সন্তানদের দারিদ্র্যের আশংকায় হত্যা করো না। আমরা তাদেরকে রিজিক দেব এবং তোমাদেরকেও। বস্তুতই তাদের হত্যা করা একটি বড় অপরাধ। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩১)

সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ ঃ

চুরি ঃ

১। চোর স্ত্রী হোক বা পুরুষ উভয়েরই হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মফল এবং আল্লাহর নিকট হতে শিক্ষামূলক শাস্তি বিশেষ। আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বজয়ী ও সর্বপ্রধান, তিনি বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

২। যে ব্যক্তি জুলুম করার পর তওবা করবে ও নিজে সংশোধন করে নিবে আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি তার প্রতি ফিরে আসবে। বস্তুত আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহ পরায়ণ।

৩। তোমরা কি জান না যে আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন যাকে চাইবেন মাফ করে দিবেন। তিনি সকল কাজেরই অধিকার ও ক্ষমতা রাখেন। (সূরা আল মায়েদা, আয়াত ৩৮-৪০)

সম্পত্তির আত্মসাত ঃ

১। হে ঈমানদার লোকেরা জেনে শুনে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। নিজের আমানতের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দিও না। (সূরা আন ফাল আয়াত ২৭)

২। ইয়াতীমের ধন মালের কাছেও যেও না। কিন্তু অতি উত্তম পন্থায় যতো দিনে না সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩৪)

লেখক : বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬
বর্ষ : ২ সংখ্যা : ৫, পৃষ্ঠা : ১০৩-১০৬

সেমিনার

ইসলাম ও সন্ত্রাস : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০৫ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে 'ইসলাম ও সন্ত্রাস : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, সংস্থার চেয়ারম্যান ও সরকারী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, প্রবীণ পার্লামেন্টারিয়ান মাওলানা আবদুস্ সুবহান এম. পি। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এম. পি। স্বাগত বক্তৃতা পেশ করেন সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী এডভোকেট মাওলানা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নাদভী। আরো বক্তৃতা করেন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাবেক সচিব জনাব শাহ আবদুল হান্নান, দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ বিশিষ্ট আলেম ও সাবেক এম.পি মাওলানা আতাউর রহমান খান, বিশিষ্ট ইসলামী বুদ্ধিজীবী মুফতী সাঈদ আহমদ এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার সহযোগী অধ্যাপক ডঃ আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে এডভোকেট নজরুল ইসলাম বলেন, এদেশে প্রায় ৬শ বছর ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। এদেশ বৃটিশ কবলিত হওয়ার পরও একশ বছর ইসলামী আইনই চালু ছিল। ইসলামী আইন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সুবিচার নিশ্চিত করে।

সভাপতির ভাষণে মাওলানা আবদুস সুবহান এম. পি বলেন, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রবন্ধকার ও সারগর্ভ বক্তব্য রাখার জন্যে আগত অতিথিবৃন্দকে। এদেশের মাদরাসা, ইসলামী রাজনৈতিক দল ও আলেম উলামাদের বিরুদ্ধে একটি মহল অপপ্রচার চালাচ্ছে। একশ্রেণীর মিডিয়া বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী মাদরাসা শিক্ষিতরা কখনো সন্ত্রাসের সাথে জড়িত ছিল না। আসলে কুচক্রীরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।

প্রধান অতিথি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এম. পি বলেন, আজ খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা, কারণ আজ তাদের ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। এদেশে সকল ধর্মের মানুষ ধর্ম কর্ম পালনের অবাধ সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন, কারণ ইসলাম পরমত সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। আমরা খৃষ্টধর্ম প্রচারক হযরত ঈসা আ.কে একজন নবী হিসেবে সম্মান করি। আমাদের

দেশে পোশাক পরিচ্ছদের ওপর কোন ধরনের বিধি নিষেধ নেই অথচ মানবাধিকারের প্রবক্তাদের দেশে রয়েছে। আমাদের দেশ ও মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোন ধর্মালয়ে আড়িপাতার ইতিহাস নেই অথচ আমেরিকার বিভিন্ন মসজিদে আড়িপাতা হচ্ছে।

মাওলানা নিজামী বলেন, এদেশের বর্তমান বোমাবাজদের সাথে প্রকৃত মুসলমান ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের কোন সম্পর্ক নেই। সমাজে শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম এসেছে। ইসলাম যৌক্তিকভাবে মানুষের কাছে তার দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে। এখানে আবেগ গোঁড়ামী ও উগ্রতার কোনই অবকাশ নেই। মদীনায় জনগণের স্বতস্ফূর্ত আগ্রহ ও সমর্থনে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে আত্মরক্ষামূলক ভাবে জিহাদ হয়েছে। সেখানে সন্ত্রাসের বিন্দুমাত্র যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

তিনি আরো বলেন, প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারো বিদ্রোহ করা কিংবা বিশৃংখলা সৃষ্টি, জনমনে আতংক ভয় ভীতি সৃষ্টির সামান্যতম বৈধতা নেই। উপমহাদেশের কোন আলেম উলামা সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করেননি। সন্ত্রাস আলেমদের পথ নয় সন্ত্রাস সূর্যসেনদের পথ। চলমান সন্ত্রাসে মাদরাসা, মসজিদের ইমাম ও ছাত্র শিক্ষকের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। শিল্পমন্ত্রী বলেন, আমি ভিন দেশের গোয়েন্দাদের একটি পরিকল্পনার কপি পেয়েছি। তাতে এদেশের সেনাবাহিনী, এদেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এসব বোমাবাজী পরিকল্পিতভাবে এদেশের মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছেদ, অসন্তোষ, বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্যে চক্রান্তের ফসল। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নামে সন্ত্রাস বিরোধী যা কিছু করা হচ্ছে, তাতে সন্ত্রাস নির্মূলের বদলে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসের পথে কিছু মানুষকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

প্রধান অতিথি বলেন, 'বাংলাদেশ পরবর্তী আফগানিস্তান' নামে একটি বই সেদিন প্রকাশিত হয় যেদিন গাজীপুরে আইনজীবীদের উপর বোমা আক্রমণ হয়েছে। এখানে ইসলামী বিচার প্রতিষ্ঠার নামে নকশালদের পথ অবলম্বন করা হয়েছে। এদেশে নকশাল সন্ত্রাস গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। গণবাহিনীর সন্ত্রাস টিকতে পারেনি। ইসলামের নামেও কোন সন্ত্রাস গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

তিনি আরো বলেন, এই সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতারা জায়নবাদী ইহুদী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক। তারা ইসলামের মধ্যে আধ্যাত্মিক ইসলাম ও রাজনৈতিক ইসলামের নামে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারে এদেশের প্রত্যেক সচেতন দেশ প্রেমিক নাগরিকদের সদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। বিশিষ্ট ইসলামী বুদ্ধিজীবী শাহ আবদুল হান্নান বলেন, বর্তমান বোমাবাজীকে কিছুতেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। এর আগে এ অঞ্চলে কখনো আত্মঘাতী আক্রমণ দেখা যায়নি। এই অবস্থা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। আজকের সন্ত্রাসের দায়ভার মাদরাসা শিক্ষিতদের উপর চাপিয়ে দেয়া বাস্তব সম্মত নয়। সন্ত্রাস দমনকে সরকার দমনের আন্দোলনে পরিণত করা মোটেও ঠিক নয়। জিহাদের অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শাহ আবদুল

হান্নান বলেন, ইসলামী আইনকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ ইসলামী আইন এদেশে বাস্তবায়িত হলে, এদেশের সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ও জালিয়াতি দূর হবে।

সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ বলেন, সন্ত্রাস ইউরোপ থেকে আমদানী করা জিনিস। আমাদের দেশের উৎপন্ন জিনিস নয়। আধুনিক যুগের সন্ত্রাসের জন্মদাতা আমেরিকা। কিউবার বিরুদ্ধে আমেরিকার সন্ত্রাসের পর বলা হয়েছে এটা কিউবানদের আত্মঘাতি তৎপরতা। মূল কথা ইসলামে সন্ত্রাস নেই। ইসলামে জিহাদ ও কিতাল বলতে যা আছে, তা মানুষ মারার জন্যে নয় মানুষ ও মনুষ্যত্বের রক্ষার জন্যে। ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে যদি কোন বাধা আসে, অথবা আত্মরক্ষার জন্যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে রয়েছে কিতাল, তা কোন অবস্থাতেই আক্রমণাত্মক নয়। মানুষকে রক্ষা করার জন্যে মানবতাকে রক্ষার জন্যে যারা সশস্ত্র জিহাদ করেছেন সেগুলো কোনমতেই সন্ত্রাস ছিল না। জেএমবি যা করছে তা জিহাদ নয় সন্ত্রাস। আর এই সন্ত্রাস ক্ষুদিরাম ও সূর্যসেনদের উত্তরাধিকার। তা কখনো সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের উত্তরাধিকার নয়। এদেশের মুসলমানরা যখন নিজেদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেলো তা নস্যাত করার জন্যে সূর্যসেন ক্ষুদিরামরা সন্ত্রাসের সূচনা করেছিল।

আবুল আসাদ বলেন, বাংলাদেশে যা চলছে, এর শিকড় অন্যখানে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিম বঙ্গের মূখ্যমন্ত্রীরা বলেন, ভারতের পাশে অকার্যকর রাষ্ট্রের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না আসলে এই দেশকে অস্থির অস্থিতিশীল করার বিষয়টির গোড়া কোথায়।

সূর্যসেন ও ক্ষুদিরামরা সন্ত্রাস করে বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন নস্যাত করতে পেরেছিল কিন্তু আজকে যারা সন্ত্রাস করছে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হবে না, কারণ আজকের বাংলাদেশের মানুষ অনেক সচেতন।

সাবেক এম.পি মাওলানা আতাউর রহমান খান বলেন, সন্ত্রাস আর জিহাদ এক জিনিস নয়। মক্কার জীবনে রসূল স. নিজেই সন্ত্রাসের শিকার ছিলেন কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর তিনি শক্তি সঞ্চয় করে ইহুদিদের সাথে মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করে মদীনাকে রাষ্ট্র ঘোষণা করে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তাঁদের নির্মূলকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ যুদ্ধ করেছেন। সেটিই কিতাল বা জিহাদ।

কোন প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র যখন বিধর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত ও নির্মূল হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয় কেবল তখনই আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধমূলক জিহাদ বা কিতাল বৈধ। যে লোকগুলো বর্তমানে বাংলাদেশে বোমা সন্ত্রাস চালাচ্ছে তারা এই দেশকে, এই দেশের সরকারকে, আলেম উলামা ও মাদরাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করার জন্য চক্রান্ত করছে। এদের উৎস অনেক দূরে পর্দার আড়ালে।

মাওলানা খান আরো বলেন, দাওয়াত প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি ও পরিবেশ সৃষ্টি করে গণমানুষের সমর্থন পুষ্ট হয়ে ইসলাম ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সন্ত্রাস বা অস্ত্র ঘাতের মাধ্যমে নয়। এই আত্মঘাতি পন্থা ইসলামে বৈধ নয়।

মুফতী সাঈদ আহমদ বলেন, বর্তমানে সন্ত্রাসের অপব্যাখ্যা হচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সরকারের অনুমোদন ছাড়া জিহাদ বৈধ নয়।

ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন, বাংলাদেশে হঠাৎ করে এই সন্ত্রাসের উৎপত্তি। ইসলামে সন্ত্রাস নেই জিহাদ আছে। জিহাদের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। ইসলামে রয়েছে কিতাল। কিতাল রাষ্ট্র নায়কের নিয়ন্ত্রণে হওয়া শর্তযুক্ত। ইসলাম কখনো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করেনি। কখনো আদর্শ চাপিয়ে দেয়ার জন্যে সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়নি। কিন্তু ইসরাঈল ও আমেরিকা তাদের আদর্শ চাপাতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

ড. আবদুল্লাহ আরো বলেন, চলমান সন্ত্রাসীদের অধিকাংশই পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষী মিডিয়াগুলো পাশ্চাত্য ধারার প্রতিষ্ঠান গুলোকে দায়ী করে না। সম্পূর্ণ প্রতিহিংসামূলক সন্ত্রাসের জন্যে মাদরাসাগুলোকে দায়ী করা হচ্ছে।

ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন, মালয়েশিয়ায় সন্ত্রাস নেই কারণ সেখানে আলেমদের নেতৃত্ব আছে, আছে আর্থিক স্বচ্ছলতা আর শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে ইসলাম। ইসলাম সন্ত্রাস সমর্থন করে না। বরং ইসলাম যতো সম্প্রসারিত হবে বেকারত্বের পরিমাণ যতো কমিয়ে আনা যাবে সন্ত্রাস ততো হ্রাস পাবে।

—শহীদুল ইসলাম

লেখা আহ্বান

এই পত্রিকায় ইসলামী আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্যভিত্তিক ও গবেষণাধর্মী লেখা এবং সাময়িক প্রসঙ্গ স্থান পাবে। যেমন-

১. ইসলামী আইনের ইতিহাস

২. বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শাসনামলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ

৩. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা

৪. ইসলামে অর্থনৈতিক, শ্রমনৈতিক, সামাজিক ও নারী অধিকার সংক্রান্ত বিধান

৫. বর্তমান যুগে মুসলিম দেশসমূহে শরীয়াহ আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনীয়তা

৬. ইসলামী আইন ও মানবাধিকার

৭. যুগে যুগে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ইসলামী আইন

৮. গণতন্ত্র ও ইসলাম

৯. ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সামাজিক সন্ত্রাস ইত্যাদি

লেখার সাথে লেখকের পরিচিতি লিখে পাঠানোকেও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় হতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ

সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

১৪ শ্যামলী রিং রোড, পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা), শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭২ ৮২৭২৭৬, E-mail : ilrclab@yahoo.com

আপনাদের প্রশ্নের জবাব

ইসলামী আইন ও বিচার এর পাতায় ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়ত এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যাবলী সংক্রান্ত প্রশ্ন আহ্বান করা হচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

বছরে ৪টি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রহাক ও এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন। নিয়মিত গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্যে রয়েছে বিশেষ ছাড়।

পাঠকের মতামত

পাঠকের মতামত আমরা আগ্রহ সহকারে ছাপাই।

গ্রাহক চাদার হার

প্রতি সংখ্যা : টাকা ৩৫, প্রতি ৬ মাসে : টাকা ৭০, প্রতি বছরে : টাকা ১৩০

ইসলামী আইন ও বিচার
গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর গ্রাহক / এজেন্ট হতে চাই

☐ আমার জন্য ☐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ☐ বছরের জন্য ☐ কপি প্রতি সংখ্যা

নাম ....

পদবী ....

পেশা ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

ঠিকানা...

.... ফোন/মোবাইলঃ...

গ্রাহক পত্রের সঙ্গে...টাকা নগদ/মানি অর্ডার করুন।

কথায় (...)।

স্বাক্ষর　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　স্বাক্ষর

ম্যানেজার

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না, ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ৩০% কমিশন ২০ কপির উর্ধে ৪০% কমিশন

=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) =৩৫৪=১৪০/=

=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) =৩৫৮=২৮০-১০=২৭০/=

=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা =৩৫ ১২=৪২০-২০=৪০০/=

গ্রাহক ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

সম্পাদক

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন- ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭১-৩৪৫০৪২

E-mail :ilrclab@yahoo.com